

অদৃষ্টের খেলা

শ্রীমানিক ভট্টাচার্য

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ড্রাট্, কলিকাতা

দেড় টাকা

প্রিন্টার
শ্রীমদেব চট্টোপাধ্যায়
ভারতীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৩/২/১ লক্ষ্মীবাগিচা স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রিন্টার শ্রীমদেব চট্টোপাধ্যায়
ভারতীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৩/২/১ লক্ষ্মীবাগিচা স্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত হারিদাস চট্টোপাধ্যায়

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার
নিদর্শন স্বরূপ “অদৃষ্টের খেলা”
আপনার নামে উৎসর্গ করিলাম।

আরম্ভাবাদ (গয়া) }
বিজয়া দশমী । ১৩৩৬ }

ভবদীয়

শ্রীমানিক ভট্টাচার্য্য

অদৃষ্টের খেলা

>

মেহেরপুর সবডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে একটা চুরির অভিযোগের বিচার হইতেছিল। আসামী প্রতিবেশীর বাড়ী হইতে চাউল চুরি করিবার সময় ধৃত হইয়া থানায় প্রেরিত হইয়াছিল। পুলিশের কাছেই সে স্বীকার করিয়াছিল যে, কয়দিন তাহার ঘরে ধান বা চাল কিছুই ছিল না তাই শেষ রাত্রে সে চুরি করিতে আসিয়াছিল। কোর্টে আসিয়াও সে ঐ কথাই বজায় রাখিল। উপরন্তু বলিল, চাউল ধার করিতে তাহার কোন আপত্তি ছিল না কিন্তু ধার চাহিলে মিলিবে না বলিয়াই সে চুরিতে নামিয়াছিল।

বলা বাহুল্য এই সরল স্বীকারোক্তি তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না। আসামীর মুখে এমন একটি ভাব ছিল, যাহাতে তাহাকে চুরির স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও সাধারণ চোর হইতে অনেকটা বিভিন্ন বলিয়া না ভাবিবার উপায় ছিল না। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল একটু বেশী ধমক দিয়া লোকটাকে হাড়া দিবেন। কিন্তু পুলিশ দেখাইল যে, ইহার আগেও সে আর একবার একখানি কাপড় চুরি করিয়াছিল এবং ধরা পড়িয়া একমাস জেলও খাটিয়াছিল। সে বারেও সে বুঝাইবার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিল যে, চুরিটা সে চুরি করিবে বলিয়া করে

নাই। রাস্তার ধারে একটি ছেলে শীতে কাঁপিতেছিল দেখিয়া একটা বেড়ার গা হইতে একখানি মোটা কাপড় তুলিয়া সে ছেলেটিকে দিয়াছিল। বেড়ার ধারেই যে গায়ের কাপড়ের মালিক চুপটি করিয়া লুকাইয়া বসিয়াছিল তাহা সে অত জানিত না। জানিলে কি সে এমনটা করিত ?

বিচারকের মনে দয়া হইলেও আইনে তাঁহার হাত পা বাধা। চোরকে বিনা শাস্তিতে ছাড়িয়া দিবার উপায় ছিল না। হৃদয় বাহাকে মুক্তি দিতে চায়, আইনে তাহাকে বন্দী না করিয়া ছাড়িবে না।

বাচিবার একমাত্র উপায় ছিল, চুরি একেবারে অস্বীকার করিয়া অন্ত চোরের ঘাড়ে ইহার বোঝা চাপাইয়া দেওয়া। চুরি অন্ত লোকে করিয়া পলাইতেছিল এমন সময় গোলযোগ উঠায় সে ঘটনাস্থলে আসিয়া পৌঁছায়। চোর সেই সুযোগে তাহারই কাছে চাউলের বোঝা রাখিয়া পলায় এবং ভাগ্যচক্রে নির্দোষ সে এই ভাবে চোর বলিয়া ধৃত হয়। উকিলের সাহায্যে এই রকম একটা গল্প বানাইয়া বলা এবং সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত করা পয়সা থাকিলে বিশেষ কঠিন হইত না। আরও সুবিধা ছিল, কেহ তাহাকে চুরি করিতে দেখে নাই। কিন্তু মার্জনা পাইবার আশায় সে সব সত্য কথা বলিয়া ফেলিয়াছিল আর উকিল দিবার তাহার সামর্থ্যও ছিল না। কাজেই তাহার শাস্তি অবশ্য প্রাপ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

বিচারকের গান্ধীর্ষ্যপূর্ণ মুখ দেখিয়া আসামী প্রমাদ গণিল। সে হাত জোড় করিয়া কহিল—“ধর্মাবতার আমার জেলে দেবেন না, দয়া করে বেত মেরে ছেড়ে দিন, আমি আর কখনও চুরি করব না।”

বিচারকের বিশ্বাস হইল যে, ইহার মনে অনুতাপের সঞ্চার হইয়াছে। এবার মার্জনা করিলে হয় তো ইহার জীবন পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু বিচারক হইয়াও তাঁহার সে ক্ষমতা ছিল না। তাঁহাকে দণ্ডাজ্ঞা

দিতেই হইল। আপন ইচ্ছায় স্বীকার করিয়াছে, অপরাধীর মনে অনুতাপ হইয়াছে ইত্যাদি হেতু দেখাইয়াও এক মাস কারাদণ্ডাজ্ঞা দিতে হইল।

‘আবার জেল!’ বলিয়া আসামী কাঠগড়ায় বসিয়া পড়িল। প্রহরী আসিয়া তাহাকে বলপূর্বক কাঠগড়ার বাহিরে লইয়া আসিল।

একটু পরে বিচারালয়ের অনতিদূরে একটা কোলাহল উঠিল।

কিছু দূরে একটা গাছের তলার আসামীর স্ত্রী বিচার ফলের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল। কাহার নিকট হইতে, ঠিক বলিতে পারা যায় না, এই মিথ্যা আশ্বাস সে পাইয়াছিল যে, তাহার স্বামী এ যাত্রা বাঁচিয়া যাইবে। স্বামীকে দূর হইতে প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায় ফিরিতে দেখিয়া সে ছুটিয়া স্বামীর কাছে আসিতেই একটি প্রহরী ধাক্কা দিয়া তাহাকে সরাইয়া দিল ও তাহাকে জানাইয়া দিল যে, তাহার স্বামীর ছয়মাস জেল হইয়াছে। এক মাসকে ছয় মাস বলিয়া প্রহরীর কোন লাভ ছিল না। তবে বন্দীর স্ত্রীর দুঃখ এই সংবাদে কিছু বাড়িতে পারে এবং দণ্ডদেশ দিবার না হউক, অন্ততঃ তাহা বাড়াইয়া বলিবার অধিকারটুকু তাহার আছে সুধু এই আনন্দ ও আশু-প্রসাদটুকু ইহাতে ছিল। প্রহরীর ধাক্কা ও স্বামীর ছয়মাস কারাবাসের সংবাদে বন্দীর স্ত্রী আর্তস্বরে একবার চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। ইহা হইতেই কোলাহলের সৃষ্টি।

প্রহরীরা বন্দীকে জোর করিয়া লইয়া গেল। যাহার সঙ্গে বন্দীর স্ত্রী আদালতে আসিয়াছিল, এই অবসরে আসিয়া পড়িয়া বন্দীর স্ত্রীকে কিছু শান্ত করিয়া সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া গেল।

বিচারকের সেদিন আর বিচারকার্যে ভাল লাগিতেছিল না। সমাজের কল্যাণের জন্য এই যে শাস্তি একজনকে তিনি দিয়াছিলেন, তাহার সে ফল আর একজন মাথা পাতিয়া লইল তাহার প্রতিকার কে করিবে?

এই নিরপরাধা নারীকে শাস্তি দিবার অধিকার তাঁহার তো কিছুই ছিলনা। এই সব চিন্তা এত দিনকার বিচারকার্যের পর আজ তাঁহাকে কাতর করিয়া ভুলিল।

তিনি ধীরে বিচারকক্ষ ত্যাগ করিয়া আপনার বাস গৃহের দিকে ফিরিলেন।

২

পূর্ব-পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার ঠিক এক মাস একদিন পরে ডেপুটি সুরেশ চট্টোপাধ্যায় বিচারগৃহ ত্যাগ করিয়া যেমন বাহির হয়েছেন একটি বছর সাতকের মেয়ে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিল—“বাবাকে তুমি বন্ধ করে রেখেছ কেন? বাবাকে ছেড়ে দাও।”

মেয়েটির করুণ স্বরে সুরেশবাবু চমকিত হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিলেন, মেয়েটির উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মলিন বসনে আরও যেন ফুটিয়া উঠিয়াছিল; সুন্দর বিধগ্ন মুখখানিতে মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতের সৌন্দর্য মাখা ছিল।

সুন্দর চাপরাসীর পানে জিজ্ঞাসু ভাবে চাহিতেই সে বলিল—“হুজুর ওর বাপের চাল চুরি করার জন্য একমাস জেল হয়েছিল; কিন্তু দিন চারি পরেই লোকটা জেলে মারা গিয়াছে।”

সুরেশবাবুর অন্তরে কে যেন কশাঘাত করিল। তিনি মেয়েটির মাথায় স্নেহভরে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার আর কে আছেন? মা আছেন?”

বালিকা বলিল, “বাবাকে তুমি আসতে দেওনি তাই মারাগ করে

পুকুরের জলে লুকিয়েছে। আমি কত ডাকলাম কিছুতেই উঠল না।
আমায় কাল থেকে কিছু খেতে দেয়নি।”

বলিয়া মেয়েটি ছোট দু'খানি হাত দিয়া মুখ চাপিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

জীবনে সুরেশবাবুকে এত বড় তিরস্কার কেহ করে নাই; আমরা যাহাকে সুরেশবাবু বলি, তায় বিচার বলিয়া গর্ব করি, তাহার এমন পরিণাম কত স্থানেই হইতেছে। সুরেশবাবু মেয়েটিকে আরও কাছে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার মা কখন পুকুরে লুকিয়েছেন?”

মেয়েটি মুখ তুলিয়া চোখ মুছিয়া বলিল, “তখন বেলা হয়েছে, রান্নাও চড়ান হয়নি তখন।”

“আচ্ছা চল, আমি তোমার মাকে, ডেকে দিচ্ছি, তোমাদের বাড়ী কোন্ দিকে?” বলিয়া সুরেশবাবু ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

মেয়েটি বলিল, “আগে তুমি বাবাকে নিয়ে চল; নাহলে মা উঠবেন না।”

সুরেশবাবু নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “আগে তোমাদের বাড়ী যাই, তার পর তোমার বাবাকে ডাকিয়ে আনাব।”

চাপরাসী বলিল, “তোমার বাড়ী কোথা? সেখানে নিয়ে চল।”

মেয়েটি তখন পথ দেখিয়ে আগে আগে চলিল। সুরেশবাবু আফিসের পোষাকেই বালিকার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

চাপরাসী অপ্রসন্ন হইয়া ইহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল।

মিনিট পনের হাঁটিয়া সকলে একটি দরিদ্র কুটারের কাছে পৌঁছিলেন। সেই কুটারের এক প্রান্তে এক খানি পুরাতন অতি জীর্ণ দারিদ্র্যের প্রতিমূর্তি গৃহে তাঁহারা আসিয়া উঠিলেন। দু'খানি মাত্র ঘর। এক খানির এক দিককার দেওয়াল নাই সেখানে খেজুর পাতা গাছের ডাল

ইত্যাদি দ্বারা নিজেদের হাতে বাঁধা বেড়া। অপর খানির ছাদের এক অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অপর অংশ এমন ভাবে বুলিয়া আছে, যে কোন মুহূর্তেই ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। যে ইট মাটি সুরকি ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল তাহা সেখানেই পড়িয়া স্থায়ী ইষ্টক ও সুরকির স্তূপে পরিণত হইয়াছে।

এই ঘরে কি করিয়া তিনটি প্রাণী এত দিন বাস করিয়া আসিতেছে ভাবিয়া সুরেশবাবু বিস্মিত হইলেন।

বালিকা সেখান হইতে তাহাদিগকে লইয়া সম্মুখকার পুকুরের দিকে গেল। পুকুরটির চারিদিক লতা-গুল্ম এবং ছোট ছোট আগাছায় ভরিয়া গিয়াছিল। লতা পাতা পচিয়া পচিয়া জলের রঙ প্রায় সবুজে পরিণত হইয়াছিল। সহরের এক প্রান্তে যে এই প্রকারের পুষ্করিণী আছে তাহাও সুরেশবাবু জানিতেন না। তাহার আদেশে ২৫ জন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল ও জলে নামিয়া মৃত দেহ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় একজনের পায় কি ঠেকিল। সেখানে কোন রকমে ডুবজল। মাত্র ডুবদিয়া উঠিয়া লোকটী বলিল, “এইখানে একটা দেহ আছে, বড় ভারী।” তখন সকলে চেষ্টা করিয়া দেহটী পাড়ের উপর লইয়া আসিল, মৃতদেহ বালিকার মায়েরি। প্রাণ অনেকক্ষণ সে দেহ ত্যাগ করিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু মরণের জন্ত কি ভীষণ আয়োজন! অর্ধেক বালি ভরা দু’টা বড় বড় কলসী দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ঘাড়ের দুইদিকে বুলাইয়া তবে সে পুকুরে নামিয়াছিল। পাছে শেষ মুহূর্তে মরণের ভয়ে কলসী দু’টি ফেলিয়া দেয়, সেই ভয়ে দড়িটা গলায় ফাঁসের মত আটকাইয়া দুর্নিবার মরণাকাঙ্ক্ষায় সে ডুবিয়াছিল। তাহার আয়োজন ব্যর্থ হয় নাই। বোধ হয় কয়েক মিনিটেই তাহার আশা পূর্ণ হইয়াছিল।

মায়ের দেহ দেখিরামাত্র বালিকা ছুটিয়া আসিয়! ‘মা ওমা’ বলিয়া মায়ের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। মায়ের হাত ধরিয়া মাথা নাড়িয়া তাহাকে উঠাইবার নানাবিধ চেষ্টা করিয়া মায়ের বুকে মাথাটি লুটাইয়া দিল।

বালিকা সংজ্ঞা হারাইয়াছিল। সুরেশবাবুর আদেশে বালিকাকে নিকটবর্তী একজনের ঘরের বারন্দায় লইয়া গিয়া তাহাকে স্নান করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। একটু পরে চক্ষু মেলিয়া চাহিতেই বালিকাকে একটু গরম দুধ খাওয়াইয়া দেওয়া হইল, গরম দুধ খাইয়া সে কিছু স্নান হইল।

এ দিকে সুরেশবাবু মৃতদেহ সংকারের ভার ও কয়েকটা টাকা একজনের হাতে দিলেন। কয়েকজন মিলিয়া মৃতদেহ সেখান হইতে উঠাইয়া লইয়া গেল।

সুরেশবাবু জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন একমাস পরে কাল এই মৃত্যু নারীর স্বামীর ফিরিবার কথা ছিল। কালই সে সংবাদ পাইয়াছিল যে, জেলে তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। রাত্রে দুই একজন তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু সে কাহাকেও তুরার খুলিয়া দেয় নাই। পাশের বাড়ীর লোকটা একবার শুনিয়াছিল, নেয়েটা বলিতেছিল—‘ওমা উঠ না, মা বড় খিদে পেয়েছে ওমন ধারা করে বসে আছ কেন? কথা কওনা মা!’ তার পর আর কিছুই সে শুনিতে পায় নাই।

মৃতদেহ স্থানান্তরিত হইয়া গেলে সুরেশবাবু মেয়েটিকে কাছে আনাইলেন। সে আসিয়াই মায়ের দেহ যেখানে ছিল সেই দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া বলিল, “আমি মার কাছে যাব।”

সুরেশবাবু সম্মেহে মেয়েটির চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, “চুপ কর; তোমার মা স্বর্গে গেছেন।”

মেয়েটি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল, “আমি তা হলে কার কাছে থাকব?”
সুরেশবাবু একটু খানির জন্তু ভাবিলেন, তিনি এখন কি করিবেন। এই
বালিকার পিতামাতার জন্তু তিনিই এক প্রকার দায়ী। তিনিই ইহার
পিতাকে জেলে না দিলে হয় ‘তো’ তাহার মৃত্যু ঘটত না এবং ইহার
মাতাকেও আত্মহত্যা করিতে হইত না। ইহার আত্মীয় কেহ নাই যাহার
কাছে ইহার থাকিবার ব্যবস্থা করিবেন। স্থির করিলেন, বালিকা যখন
তাঁহারই জন্তু নিরাশ্রয়, তিনি ইহাকে আশ্রয় দিবেন।

একখানি গাড়ী ডাকান হইল, মেয়েটির হাত ধরিয়া সুরেশবাবু গাড়ীতে
উঠিলেন। নিরাশ্রয়ের আশ্রয় মিলিল।

৩

মেয়েটিকে আশ্রয় দিবার পর এক সপ্তাহ অতীত হইয়াছে। সন্ধ্যার
পর সুরেশবাবু তাঁহার গৃহিণী সুনীলাসুন্দরীর সহিত কথা কহিতেছিলেন।

সুরেশবাবু। ইন্দুর মন একটু বসেছে তো?

সুনীলা। এত শীগগির কি ক’রে বসবে বল! এখনো তার ভাল
ক’রে ভয় ভাঙ্গেনি। দেখনি, কোটের পোষাক প’রে তুমি বাসায় এলেই
ওর মুখখানি শুকিয়ে যায়?

সুরেশ। তাই নাকি? তা ওরও বড় দোষ নেই। আগাকে কোটের
পোষাকে দেখলে বোধ হয় ওর বাপের জেলের কথা মনে পড়ে। যতই
স্নেহের কথা বলি না কেন, ও ভাবটা ওর মন থেকে কিছুতে যাচ্ছে না।

সুনীলা। তোমার ব্যবহারে যে একেবারে ফল হয়নি তা নয়। তুমি

যখন কোর্টের পোষাক ছেড়ে ধুতি পর, তখন তার চোখ থেকে ভয়ের ভাবটা কেটে যায়। তোমার কথায় তার মন নরম হ'য়ে আসে।

সুরেশ। দেখ, ওকে তোমার ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশী যত্ন কোরো। একরকম ধরতে গেলে আমার জন্মই ও বাপমাকে হারিয়েছে।

সুশীলা। এ কথা তোমার মনে করা উচিত নয়। তুমি তো রাগ ক'রে বা নিজের স্বার্থের জন্ত ওকে শাস্তি দাওনি। আইনে যা বলে, যা না দিলে উপায় নেই, তাই দিয়েছ। এর জন্ত মন খারাপ কোরো না। ইন্দুর বত্বের জন্ত তুমি ভেব না। আমি ওর মন বসাব। হাজার হোক বড় অভাবের ঘর থেকে এসেছে কি না, তাই একটুখানি ডাঙ্গার মাছের মতো হয়েছে। কিছুদিন আমাকে সময় দাও সব ঠিক ক'রে নেব। আমাকে কি তোমার বিশ্বাস হয় না?

সুরেশ। বিশ্বাসের কথা আর নতুন ক'রে তুলছো কেন? তোমাকে অবিশ্বাস করবার উপায় যে রাখিনি। হাসছ যে?

সুশীলা। একটা পুরাণো কথা মনে হ'ল তাই।

সুরেশ। কি কথা?

সুশীলা। অনেক কাল হয়ে গেছে, যাক সে কথা।

সুরেশ। তা হ'কগে। বলই না!

সুশীলা। তখন সবে যতীন হ'য়েছে। কোথা থেকে একটা আজগুবি খবর শুনে এসে দিনকতক আমাকে কি জ্বালাতনই কত্তে। কে একজন বড়লোক বাড়ী থেকে বেরনার সময় তার স্ত্রীকে ঘরের মধ্যে চাবি বন্ধ ক'রে যেত। সে সুন্দরী ছিল এই তার অপরাধ। তুমি দিনকতক তাই চালাকি আরম্ভ করেছিলে—হ্যা গো জানালামার দিকে এতক্ষণ তাকিয়েছিলে কেন? কে একজন লোক রাস্তার ওধার থেকে হাঁ করে যেন গিল্ছিলো তোমার মনে পড়ে না?

সুরেশ। খুব পড়ে। আর এই ঠাট্টা করার ফলটুকুও তোমার মনে আছে ?

সুশীলা। তা আবার নেই। আমিই তো তোমাকে সে কথা বলেছিলাম। আমার কিন্তু চিরদিন মনে থাকবে কি উদ্বেগের সঙ্গেই মা বলেছিলেন—তোমাকে বৃষ্টি আজকাল অবিশ্বাস কত্তে শুরু করেছে ! এ দুর্বুদ্ধি তার কতদিন হয়েছে ? অবিশ্বাস করেন না বলতে গিয়ে মার কাছে উল্টো বকুনি খেলাম। তখন লজ্জার মাথা খেয়ে সব বৃষ্টিয়ে বললাম। সমস্ত মুখখানি তাঁর হাসিতে ভরে এল। এতও জান বাছা তোমরা—বলে মা সেখান থেকে চলে গেলেন। এই সব কথা বলে তবে তোমার ঠাট্টা বন্ধ করি।

সুরেশ। কত কাল হ'য়ে গেছে সে সব কথা। এখনও মনে হ'লে ভাবি বৃষ্টি যৌবন ফিরে এল।

সুশীলা। তোমার ওই ফিরে এল কথাটি আমি কখনও মানব না। মনের যৌবন তোমার কোন দিন যাবে না। আজকালকার অকালবৃদ্ধ যুবকদের ও তোমার কথা ভাব দেখি ! প্রায় একেবারে নিরক্ষর হয়ে তোমার কাছে এসেছিলাম, মনে আছে ত ? তোমার চিরনবীন মন তাই না আমাকে কোন রকমে চলবার মতো করেছ !

সুরেশ। আমার চিরযৌবন ও নবীনতার প্রসঙ্গ এখন থাক। আচ্ছা বাপমার জন্তু ইন্দু কঁাদে ?

সুশীলা। তা আর কঁাদবে না ? এই ততো বাপমাকে হারিয়েছে এখনও এক হপ্তা পেরোয়নি। যত্ন ক'রে হাতে খাবার দিতে গেছি, দেখি—তার চোখ দু'টি জলে ভর এসেছে। রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এক একবার মা মা করে কেঁদে ওঠে। সে দিন তুমি মফঃস্বলে গিয়েছিলে, শেষ রাতে উঠে দেখি—ইন্দু তার বিছানায় নেই। খুঁজতে গিয়ে দেখি

ঘরের কোণটিতে বসে মুখ গুঁজে কাঁদছে। আমি কাছে যেতে বল্লে—
আমি মার কাছে যাব। মার জন্ম আমার মন কেমন কর্ছে। এখনো
দিনকতক এ রকম যাবে। তারপর আমাদের বাড়ীই নিজের বাড়ী বলে
মনে করবে। হ্যাঁগা সে কথার কি হ'ল? মেয়েটির বাপমার বংশের
পরিচয় তো নেয়া দরকার। যখন এর ভার নিয়েছ বিয়ে তো দিতেই
হবে। হঠাৎ যদি বদলি হয়ে যাও তো শেষটা ভাল করে কিছু জান্তেই
পারবে না।

সুরেশ। আজকে জান্তে পারব বোধ হয়। ওই পাড়াতেই ওদেরই
একজন আত্মীয় আছেন। তাঁরই আজ আসবার কথা আছে। সকালের
দিকেই আসবেন। এখন উঠি, অনেক কাজ আছে।

সুরেশবাবু উঠিয়া বাহিরে আফিসে গিয়া সরকারি ডাক ও সাধারণ
পত্রাদিতে মনোনিবেশ করিলেন।

আজ প্রভাতে যৌবনের—জীবনের—বসন্তপ্রভাতের—কথা মনে পড়ায়
সুশীলাসুন্দরীর স্মৃতি প্রজাপতি রঙিন পাখা মেলিয়া কুড়ি বৎসর
আগেকার পৃথিবীর বুকে ফিরিয়া গিয়াছিল। বিবাহের প্রথম দিন হইতে
স্বামীর একনিষ্ঠ প্রেম লাভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত সেই প্রাণপূর্ণ প্রেমের শিখা
অথগু রাখিবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। কি অবিরল অনুরাগ ও
অসীম অধ্যবসায় লইয়া স্বামী তাঁহাকে শিক্ষার দ্বারা নিজের মনের মতো
করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন—তাহা ভাবিতেও তাঁহার নারী-হৃদয় আজ
নবীন হইয়া উঠে! দু'জনেরই প্রেম চিরদিন সমান তেজে দু'জনেরই হৃদয়
দীপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল; একটি দিনের জন্মও তাহা ম্লান হইবার অবসর
পায় নাই;—তাই না হৃদয়ে বাহিরে সর্বত্র আজ শান্তি বিরাজিত। তাই
না—তাঁহাদের পুত্র-কন্যাগুলি সব ফুলের মতো সুন্দর দেহ ও মন লইয়া
জন্মিয়াছে। পিতামাতার প্রেম যে পুত্র কন্যাদের মুখে গোলাপের গন্ধ ও

বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা উহাদের মুখের পাশে একবার চাহিলেই বুঝা যাইবে !

সুশীলাসুন্দরী এই সব ভাবনায় তন্ময় হইয়া আসিতেছেন এমন সময় একটি সুন্দরী বালিকা—রবীন্দ্রনাথের “শিশু”খানি হাতে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—‘নদী’ কবিতাটির এইখানটি ভাল করে বুঝিয়ে দাওনা মা !”

“কোনখানটা দেখি ?” সুশীলাদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন ।

বালিকা বইখানি মায়ের সম্মুখে খুলিয়া পড়িল ;—

সেই	নীল আকাশের পারে,
সেথা	কোমল মেঘের গায়ে,
সেথা	শাদা বরফের বুকে
নদী	ঘুমায় স্বপন-সুখে ।
কবে	মুখে তার রোদ লেগে
নদী	আপনি উঠিল জেগে ;
কবে	একদা রোদের বেলা
তাহার	মনে পড়ে গেল খেলা,
সেথা	একা ছিল দিন রাত,
কেহই	ছিলনা খেলার সাথী ;
সেথা	কথা নাহি কারো ঘরে,
সেথা	‘গান কেহ নাহি করে ।
তাই	ঝুরু ঝুরু ঝিরি ঝিরি
নদী	বাহিরিল ধীরি ধীরি ।
মনে	ভাবিল যা আছে ভবে
সবই	দেখিয়া লইতে হবে !

সুশীলাসুন্দরী বইখানি হাতে লইয়া কল্পনা ও সত্যের একাগ্র সমাবেশ নদীর এই বিচিত্র জন্মকাহিনী অতি সুন্দর ভাষায় বালিকাকে বুঝাইয়া দিলেন। কল্পনা-চক্ষে পাহাড়ের শিরে সেই শব্দহীন জীবশূন্য বরফের দেশে যেখানে মাতৃঅঙ্কে শিশুর মতো নদী নিদ্রিত মোহাচ্ছন্ন হইয়া আছে। হঠাৎ একদিন সূর্য্যকর আসিয়া ডাকিল—ওগো ওঠ, আর কতকাল ঘুমাইবে ?

নদী চক্ষু মেলিয়া চাহিল। বরফশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল। দেশ বিদেশের নূতন আলো, নূতন গান, নবীন প্রাণ দেখিবার জন্ম বাহির হইল।

সপ্তদশবাঁয়া স্বপ্নাবগুষ্ঠিতা সুন্দরী যুবতী দুয়ারের কাছে আসিতে সুশীলা জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বোমা ?

যুবতী নিম্নস্বরে বলিলেন—কি রান্না হবে একবার বলে দেবেন মা ?

“দিচ্ছি চল মা” বলিয়া সুশীলা সুন্দরী সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া রান্না ঘরের দিকে চলিলেন।

সুরেশবাবুর বয়স পঞ্চাশ বৎসর। তাঁহাদের স্ত্রীর বয়সও প্রায় চল্লিশ হইয়াছে। তাঁহার আদি নিবাস পূর্ব্ববঙ্গে ; কিন্তু কলিকাতাতেই ইঁহার পিতার সময় হইতেই বসতি। ইঁহারা দুই ভাই ; ইনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, ছোট ভাই মুন্সেফ। সুরেশবাবুর দুই পুত্র ও পাঁচ কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র ফণীন্দ্র এম-এ, বি-এল, পাশ করিয়া কলিকাতায় হাইকোর্টে—পিতার এক বন্ধুর জুনিয়র হইয়া বাহির হইতেছেন। কনিষ্ঠ মণীন্দ্র মেহের পুরেরই স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছে।

এই চট্টোপাধ্যায় পরিবার শিক্ষাকে জীবনের একটি প্রধান আনন্দের উপাদান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সুশীলাসুন্দরীর যখন বিবাহ হয়—তখন তিনি ষৎসামান্য বাংলা শিখিয়া

আসিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু স্বামীর ইচ্ছা ও চেষ্টায় তাঁহাকে খুব ভাল বাংলা, মোটামুটি ইংরাজী ও গান শিখিতে হইয়াছিল। সুরেশবাবু নিজে খুব ভাল গাহিতে পারিতেন। স্ত্রীকেও তিনি অতি যত্নে সুন্দর গাহিতে শিখাইয়াছিলেন। সুশীলার মধুর কণ্ঠের সুন্দর গান শুনিয়া তিনি বলিয়াছেন—সামান্য চেষ্টায় তোমার কণ্ঠে কেমন সুন্দর সুরের সৃষ্টি হ'ল বল দেখি ! অবহেলায় এটা যদি হারাভূম কত বড় একটা অশ্রায় হ'ত ভাব ত ! যখন ক্লান্ত বা বিমর্ষ হ'য়ে আস্ব তুমি আমাকে কতখানি আনন্দ দিতে পারবে ভেবে দেখ। আর দেখবে আমাদের ছেলেমেয়েদেরও গানের দিকে কেমন একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ হবে। তারা অল্পায়াসে শিখবেও।

মেয়ে মানুষের গানে কি দরকার ?—কেহ বলিলে তিনি বলিতেন—সুকণ্ঠের দরকার কিসে নয় বল ? একটা স্তব পড়বে তাতেও সুর আছে। ভগবান্ কণ্ঠে কণ্ঠে সে সুর দিয়েছেন তার চর্চা সবারই দরকার। আর মজা দেখ ; কাহারও বাড়ীর বাহিরের ঘরে গিয়ে বস, বাড়ীর ভিতর থেকে উচ্চ কণ্ঠে কথাবার্তা খুব শুনতে পাবে। এমন কি অজ্ঞাতভাবে যদি থাকতে পার ঝগড়া পর্যন্ত বাদ যাবে না। এসব আমরা দেখা বলে মনে করিনে আর এর জন্ত লজ্জিতও হইনে। কিন্তু গোপনে গীত গানের একটা ছত্র যদি আমাদের কানে আসিয়া পৌঁছায়। তাহা হইলেই সর্বনাশ হইয়া যাইবে !

এই দুইটি পুরুষ ও নারী নিজেকে ভাল না বাসিয়া একজন অপরকে সত্য সত্যই ভালবাসিত তাই তাঁহাদের গৃহে শান্তি ও চিত্ত প্রেম চিরদিন বিরাজ করিতেছিল।

ইন্দুর বাপের আত্মীয়টি ইন্দুর বাপ সম্বন্ধে বড় বেশী কিছু বলিতে পারিলেন না। কেবল বলিলেন, তাহার নাম সঞ্জীবচন্দ্র রায়, জাতি ব্রাহ্মণ, দূর সম্পর্কে ইহার ভাগিনের এই পর্য্যন্ত! তাঁহার নিকট আরও এইটুকু জানা গেল—সঞ্জীব লোকটি একটু অদ্ভুত প্রকৃতির। ইদানীং বড় একটা কাহারও সহিত কথা কহিত না। আগে এখানেই ছোট খাট কাজকর্ম করিত। তারপর উহার মেয়েটি জন্মানোর পর চুয়াডাঙ্গায় কি একটা চাকরি লইয়া গিয়াছিল। গত ছয়মাস হইতে আবার এখানে আসিয়াই স্থির হইয়া বসিয়াছিল। কেহ বলিত চুয়াডাঙ্গায় চাকুরি ছাড়িয়া দিয়াছিল; কাহারও বিশ্বাস কাজে জবাব হইয়া গিয়াছিল।

আত্মীয়টি এই পরিচয়টুকুর সঙ্গে একটা বড় ষ্ট্রীলট্রাঙ্ক দিয়া গেলেন। ট্রাঙ্কটি পুরাতন হইলেও খুব সুদৃশ্য, বৃহৎ ও মূল্যবান; চাবি তাঁহার কাছে ছিল না সেজন্য ভিতরে কি আছে তিনি জানেন না।

সন্ধ্যার পর সুরেশবাবু ট্রাঙ্ক খুলিয়া দেখিলেন, জিনিস পত্র কিছু নাই বলিলেই হয়! কেবল কতকগুলি পুরাতন চিঠি ও দুইখানি সঞ্জীবের হাতের লেখা খাতা—ডায়েরী গোছের।

যে মানুষ ডায়েরী রাখে, ভদ্রবংশে জন্মলাভ করিয়াছে, কেমন করিয়া তাহার প্রতিবাসীর গৃহ হইতে চাউল চুরি করিতে প্রবৃত্তি হইয়া ভাবিয়া সুরেশবাবু বিস্মিত হইলেন। ইন্দুর বাপের পরিচয় ইহা হইতে হয়ত কিছু জানিতে পারিবেন ভাবিয়া তিনি প্রথম ভাগ চিহ্নিত ডায়েরীখানি খুলিয়া 'সুশীলাসুন্দরীকে শুনাইয়া শুনাইয়া পড়িতে লাগিলেন। সমগ্র ডায়েরী

উদ্ধৃত না করিয়া পরিচয়ের জন্য যেটুকু দরকার তারিখ বাদ দিয়া আমরা তাহারই উল্লেখ করিব।

৩।১। কাল প্রোমোশন হইয়া গেল! এবার তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিলাম। তৃতীয় শিক্ষক মহাশয় আমাদের ক্লাশে ইংরাজী পড়াইবেন। ডায়েরী রাখার উপকারিতা বুঝাইয়া তিনি আমাদের সকলকে ডায়েরী রাখিতে বলিলেন। তাই আজ হইতে ডায়েরী রাখা আরম্ভ করিলাম। ফাষ্ট হইয়াছি বলিয়া কাল একটু আনন্দ হইয়াছিল। কিন্তু এ সংবাদে মায়ের চোখে জল আসিল কেন বুঝিলাম না। বোধ হয় বাবা নিরুদ্দেশ—সে জন্মই মায়ের এ দুঃখ হইয়াছে।

১০।১। সুশীল মিছামিছি আমার সহিত বিবাদ করিয়া বিনাদোষে দুর্ভাক্য বলিল। গেল বৎসর সে ফাষ্ট হইয়াছিল এবার আমি হইয়াছি—এই আমার অপরাধ।

এই ফাষ্ট হইবার কথা উল্লেখ করিয়াই সুশীল বলিল—বাবা বলিয়াছেন জারজ ছেলেদের বুদ্ধি একটু বেশী হয়ে থাকে। সঞ্জীব ফাষ্ট হয়েছে তাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছু নেই।

২০।১—এসব দুর্ভাক্য আর সহ্য করিতে পারি না। কাহার উপর রাগ করিব? বাবার উপর? তাঁহাকে তো কখন দেখি নাই। মায়ের উপর? তাঁহার কি দোষ? বাবা যদি সমস্ত কর্তব্য ঝাড়িয়া ফেলিয়া নিরুদ্দেশ হন, মা কি করিতে পারেন? মাকে আসিয়া আজ বলিলাম—মা তুমি কেন শ্বশুরবাড়ী গিয়া থাক না?

মা উত্তর না দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম—মা, চল, আমাদের যেখানে বাড়ী সেখানেই গিয়া আমরা থাকিব। লোকে তোমার বড় নিন্দা করে; আমি তাহা সহ্য করিতে পারি না।

মা বলিলেন—সেখানে যাইবার উপায় নাই।

আমি কহিলাম—তঁাহারা টাকা পাঠান আর গেলে দু'মুঠা খাইতে দিবেন না ?

মা উত্তর দিলেন—টাকা তোমার বাপের এক বন্ধুর হাত দিয়া আসে ।

আমি আর সহিতে পারিলাম না । রাগিয়া বলিলাম—এসব কি কথা মা ? বাবা নিরুদ্দেশ । দাদানহাশয়ের কাছে বাইবার উপায় নাই । বাবার বন্ধু টাকা পাঠান । এ সব কি কথা আমাকে বুঝাইতেছ ? তবে কি এরা যে সব কথা বলে—

মা আমার মুখ চাপিয়া ধরিয়া কথা শেষ করিতে দিলেন না । রাগ ও অভিমানে আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম । আমার চোখ মুছাইয়া মা বলিলেন—ছি বাবা, ও কথা আর মুখে আন্তে নেই । মাকে ও কথা বলে !

ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে মাকে বলিলাম—তুমি কেন সব কথা আমাকে বলছ না !

মার নিজের চক্ষেও জল আসিয়াছিল । চক্ষু মুছিয়া তিনি বলিলেন—তোমার বাবা নিরুদ্দেশ নন । আমাকে তিনি গোপনে বিবাহ করিয়াছিলেন । ভাবিয়াছিলেন আমার শ্বশুরকে বিবাহের কথা পরে বলিবেন । ইহার কিছুকাল পরে তোমার বাবা পুনরায় বিবাহ করেন । আমার সহিত যে তঁাহার বিবাহ হইয়াছিল একথা আর তঁাহার বলিবার সুবিধা হয় নাই । তা বলিয়া আমাকে একেবারে ভোলেন নাই । বৎসরে ৩৪ বার আমার বাপের বাড়ী আসিতেন । গোপনে আসিতেন, গোপনেই চলিয়া যাইতেন । হঠাৎ এই সম্বন্ধে একটা কানাঘুসা আমার শ্বশুরের কানে পৌঁছায় । তখন তোমার বয়স দেড় বৎসর । এক রাত্রে হঠাৎ তোমার বাবা আসিয়া বলিলেন, তিনি বড় বিপন্ন । এই বিবাহের একটা

সন্দেহ তাঁহার বাপের মনে হইয়াছে। তিনি এখানেও সন্ধানের জন্য লোক পাঠাইতে পারেন। এই বিবাহ প্রকাশ পাইলে পিতার সমস্ত সম্পত্তি হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হইবে; লোকের কাছে মুখ দেখাইতে পারিবেন না। পরদিনই তিনি নিজে ব্যবস্থা করিয়া আমার এক দূর-সম্পর্কের মামার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া গেলেন। তাহার পর তাঁহাকে আর কখন দেখি নাই। স্ত্রী মাস শেষ হইলে এক অপরিচিত লোকের প্রেরিত ত্রিশটি করিয়া টাকা মণিঅর্ডারে আসে মাত্র।

মায়ের চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। আমার চক্ষে জল আসিল না। পিতার উপর এক দারুণ ক্রোধ আমার মনে পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল। তাঁহার দোষেই তাঁহার মিথ্যা কথার জন্যই মাকে আমার এমন হীন অবস্থায় থাকিতে হয়; আমাকে লোকের কাছে দুর্বাক্য শুনিতে হয়।

৩০।১—লোকে বলাবলি করে আমার মা নাকি আমার পিতার বিবাহিতা স্ত্রী নহেন। স্ত্রী টাকা নিয়মিত আসে; তিনি কখন আসেন না—তাই বোধ হয় এই কথা উঠিয়াছে। শিক্ষকেরা বলেন, পুস্তকেও লেখা আছে—পিতা দেবতাতুল্য; তাঁহাকে ভক্তি করিতে হয়। কিন্তু বলিতে নিজের উপরেই ঘৃণা হয়—পিতার কথা উঠিলেই দারুণ লজ্জায় আমার মন সংকুচিত হয়। আমার মাকে বিবাহ করিয়া সে বিবাহ অস্বীকার করিয়া পুনর্বার যিনি বিবাহ করিয়া নিশ্চিন্ত সুখে আছেন, তাঁহাকে কি করিয়া ভালবাসিব ও ভক্তি করিব!

মণিঅর্ডারে যখন টাকা আসে আমার মনে হয় টাকাটা ফিরাইয়া দিই। টাকায় যেন আরও অপমান বাড়াইয়া তুলে। ইচ্ছা হয় স্কুল ছাড়িয়া দিয়া কাহারও কাছে সামান্য চাকরের কাজ লইয়া মাকে খাওয়ানো কখনও টাকা লইব না। মাকে একদিন এ সংকল্পের কথা বলিলাম। মা

বলিলেন—পাগল ছেলে, তা কি করিতে আছে! তুই লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইবি—এ যে আমার বড় আশ্বাস।

—জানুয়ারী। এক বৎসর কাটিয়া গেল। আমি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিলাম। এবার সুশীল খার্ড হইয়াছে, আমি সেকেণ্ড হইয়াছি। ইচ্ছা করিয়াই ফার্স্ট হইবার লোভ এবার ত্যাগ করিয়াছি। দুইখানি অঙ্ক সমস্ত ঠিক করিয়া উত্তরের বেলা ইচ্ছা করিয়া ভুল করিয়া দিয়াছি। কি করিব। নহিলে সে বছরের মত এবারও দুর্ভাগ্য সহিতে হইত। কিন্তু জানা জিনিস, ইচ্ছা করিয়া না লিখিয়া ছাড়িয়া দেওয়া, আর ইচ্ছা করিয়া অঙ্কের উত্তর ভুল করা কি শক্ত তাহা আর কি বলিব! কাগজ রাখিয়া চলিয়া আসিবার সময়ে চোখে জল আসিয়াছিল। কেহ দেখিবার আগেই তাহা মুছিয়া ফেলিলাম। তা হউক, ফার্স্ট না হয় নাই হইয়াছি, কিন্তু দুর্ভাগ্য হইতেও বাঁচিয়াছি। এবার হইতে পড়িবার বই কম করিয়া পড়িব। তাহা হইলে জানিয়া উত্তর না করার কষ্ট হইতে বাঁচিয়া যাইব।

—ফেব্রুয়ারী—। আজ সকালে মা একটি প্রকাণ্ড বিবাদ ঘাড়ে করিয়া আনিয়াছেন। এই পাড়াতেই এক বিধবা ব্রাহ্মণী ছিলেন; মা তাঁহাকে সহি বলিতেন, আমি তাঁহাকে সহিমা বলিয়া ডাকিতাম। এই একটি মাত্র প্রাণীর সহিত মা প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতেন। উভয়ে উভয়কে সত্যসত্যই ভালবাসিতেন। গত পরশ্ব তিনি কলেরায় আক্রান্ত হন। কাল রাতে মারা যান। মা কল রাতে সেখানেই ছিলেন। ইহাদের অবস্থা আমাদের চেয়েও শোচনীয়। পরের ভাঙ্গা পড়ীতে থাকিতেন। মুড়ি ভাজিয়া, চিঁড়া কুটিয়া, পৈতা তুলিয়া কোন রকমে আপনার ও একটি সাত বছরের মেয়ের অন্নের সংস্থান করিতেন।

সকালে মা সহিমার সংকারের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার মেয়েটিকে সঙ্গে

লইয়া আসিয়াছেন। আমাকে বলিলেন, গিরিবালা আজ হইতে এখানেই থাকিবে; আমি সইয়ের মৃত্যুশয্যায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। মায়ের কথা শুনিয়া আমার হাসি পাইল। সেদিন ক্লাসে শুনিয়াছিলাম *one blind man leading another* (এক অন্ধ অপর অন্ধকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে); এও তাই, মেয়েটি সম্মুখে বসিয়া কাঁদিত্তেছিল বলিয়া আর কিছু বলিলাম না।

রাত্রে মেয়েটি ঘুমাইলে মা আর যাহা বলিলেন, তাহা শুনিয়া তো আমার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। মা আরও একটি সাধু কাজ করিয়া আসিয়াছেন। এই গিরিবালার সহিত আমার বিবাহ দিতেও প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। অশোচ কাটিয়া গেলেই সামনের ফাল্গুনেই বিবাহ দিবেন বলিলেন। এত তাড়াতাড়ির কারণ—শেষে যদি কোন বিষ উপস্থিত হয় তখন মেয়েটির কি গতি হইবে।

মার উপরে বড়ই রাগ হইল। আপনি শুতে ঠাই পায়না শঙ্করাকে ডাকে—যা তাই করিয়াছেন। মাকে বলিলাম তিনি জানিতেন যে, আমার বিবাহ হওয়া অসম্ভব ছিল। একে গরীব, তায় লোকনিন্দা একটা আছে, এ অবস্থায় কেহই মেয়ে দিতে রাজী হইত না। সে জন্ত ফাঁকি দিয়া মা এ ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি যে কিছুতেই এ বিবাহ করিব না তাহা মাকে বিশেষ করিয়া জানাইলাম।

মার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বলিলেন স্বামীর অবজ্ঞা জীবন ভরিয়া বহিতে হইয়াছে। পুত্রের কাছে তাঁহার প্রার্থনা, সে যেন তাঁহাকে অবহেলা না করে।

মা একেবারে বালিকার মত ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমি অবাক। এই কথায় মায়ের এত কষ্ট হইল কেন? বোধ হয় মা আমার বেশী আশা করিয়াছিলেন; তাই আমার অস্বীকারে এত ব্যথা পাইয়াছেন।

মায়ের অবাধ্য হইব না বলিয়া মাকে শান্ত করিলাম ।

—ফাল্গুন মাস—। মা বলিলেন ১৬ই ফাল্গুন ভাল দিন আছে ; ঐ দিন আমাদের বিবাহ হইবে । মাকে অনুরোধ করিলাম—আর ২।৪ মাস থাক না মা ; আমরা কেহই তো পলাইব না ! মা বলিলেন, সইয়ের মৃত্যুশয্যায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এমাসে বিবাহ না দিলে যে পাপ হইবে । আমি আর কিছু বলিলাম না ।

১৬ই ফাল্গুন ।—বিবাহ হইয়া গেল । বরযাত্র নাই, বাণ্ড নাই, কোন বালাই নাই ! মাকে বলিলাম—পুরোহিতেরই বা দরকার কি মা ? মা বলিলেন বিবাহ লইয়া ঠাট্টা করিতে নাই ।

চৈত্রমাস ।—গিরিবালা আমার স্ত্রী হইয়াছে । আর যা হউক মা একটু প্রফুল্লিত হইয়াছেন এই টুকুই লাভ । গিরিবালা ১০ বছরের মেয়ে হইলেও মাকে খুব সাহায্য করে । আমাকে দেখিয়া কিন্তু মোটেই লজ্জা করে না । সেদিন কি মনে হওয়ায় খানিকটা ঘোমটা দিয়াছিল । মা বলিলেন, তাঁহার সামনে আবার ঘোমটা কেন ? সেই দিন হইতে ঘোমটার বালাই নাই ।

আমার মনে হইল, ইহাতে আমাকে একটু অপমান করা হইতেছে ! একদিন তাহাকে বলিলাম—সবাই তো স্বামীকে দেখিয়া ঘোমটা দেয় তুমি দেওনা কেন ?

গিরিবালা বলিল, মা বারন করিয়াছেন । আমি পুনরায় বলিলাম—আর সবাই দেয় কেন ? তাদের মা বৃদ্ধি বারন করেন না ?

গিরিবালা উত্তর করিল—তোমাকে যে আমি আগে থেকে জানি । তুমি তো নতুন নও ।

আমি দেখিলাম, কথাটা ঠিক ।

বৈশাখ মাস—সকালে স্কুল হইতেছে । স্কুল হইতে আসিয়া মাকে

শুইয়া থাকিতে দেখিলাম। শুনিলাম সকালে একবার উঠিয়াই আবার শুইয়া পড়িয়াছেন। জ্বর লইয়াও মাকে কাজ করিতে দেখিয়াছি। খুব বেশী না হইলে আর মা শয্যাগ্রহণ করেন নাই। গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম. গা খুব গরম। চোখ লাল। গিরিবালা বলিল—কালও জ্বর ছিল, তবে কম, মা গ্রাহ্য করেন নাই; জ্বর গায়েই সব করিয়াছেন।

১২ই বৈশাখ—মায়ের সমান অবস্থা। ডাক্তার তিন দিন হইতে দেখিতেছেন। রোগ কঠিন বলিয়াছেন। মা যদি না বাঁচেন, কি হইবে? সে কথা ভাবিতেও ভয় হয়। গিরিবালা ও আমি পালা করিয়া রাত জাগি। দিনে দুই জনেই থাকি।

১৫ই তারিখ—দুই দিন পরে সন্ধ্যাকালে মা কথা বলিলেন—আমি মরিলে তোমরা ভয় পাইও না। মাসে কিছু বাঁচাইয়া যে টাকা জমিয়াছে, এই ঘরের দক্ষিণ কোণে পোতা আছে। আমার আত্মের জন্ত অতি সামান্য খরচ করিও। একজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচ জন গরীব লোক খাওয়াইয়া দিও। যদি ব্রাহ্মণ খাইতে আপত্তি করেন বেশী চেষ্টা করিও না। পাঁচটি গরীবকে খাওয়াইলেই আমার আত্মার তৃপ্তি হইবে।

রাত্রি বোধ হয় ১২টা হইবে। গিরিবালাকে মা চুপি চুপি কি বলিলেন। গিরিবালা একটা পুরাতন কাঠের বাক্স খুলিয়া কি একটা জিনিস মায়ের হাতে দিল। গিরিবালাকে মায়ের কাছে রাখিয়া আমি তখন একটু বিশ্রাম করিতেছিলাম। মা ভাবিয়াছিলেন আমি ঘুমাইয়া ছিলাম। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম গিরিবালার দেওয়া জিনিসটি একখানি চিঠি। পড়িবার জন্ত মা চিঠিখানি হাতে লইয়াছিলেন। চিঠি হাত হইতে পড়িয়া গেল। মা গিরিবালাকে চিঠিখানি চোখের সামনে ধরিতে বলিলেন। গিরিবালা তাহাই করিল। বোধ হইল, পড়িতে পারিলেন না। যেন বড়ই দুঃখের সহিত বলিলেন আর কিছু দেখতে পাচ্ছিনে বোমা।

তারপর আপনিই শান্ত হইয়া বলিলেন—তা হোক বোমা! ব্যস্ত হোয়োনা। চিঠিখানা আমার মাথার একবার রাখ তো মা। ই্যা ঠিক হয়েছে মা।

বলিয়া খানিকক্ষণ মা স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, তুমি সাবিত্রী সমান হও মা! ওখানা বালিশের তলায় রেখে একবার নঞ্জীবকে ডেকে দাও তো।

গিরিবালা কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া আমাকে ডাকিল। আমি এক প্রকার কপট নিদ্রা হইতে উঠিয়া মায়ের কাছে আসিলাম। মা বলিলেন—তিনি আর বাঁচিবেন না। দুইজনে মিলিয়া কি করিয়া সংসার চালাইতে হইবে সব বলিলেন। একটা কথা আমাকে বিশেষ করিয়া বলিলেন—আমি যেন আমার পিতাকে কিছুতেই বিপন্ন না করি। যদি কখন টাকা পাইতে বিলম্ব হয় বা—ভগবান্ না করুন—টাকা পাঠানো বন্ধ হইয়া যায় তথাপি আমি যেন সে জন্ত বাবার কাছে যাইবার বা টাকা আদায়ের চেষ্টা না করি।

মা আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন। আমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। রাগও হইতেছিল।

শেষ রাত্রে মায়ের আদেশে আমরা দু'জনে মাকে বাহিরে ভুলসী-তলায় লইয়া আসিলাম। রোজ সকালে মা একটি গঙ্গাস্তোত্র আবৃত্তি করিতেন। আমাকে মা তাহা শুনাইতে বলিলেন! আমি সমস্ত স্তোত্রটি শুনাইলাম। ধীরে ধীরে মা চক্ষু মুদিলেন। আর ডাকিয়া সাড়া পাইলাম না। তখন দুইজনে মায়ের বুকের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

১৬ই তারিখ—সকাল হইতেই প্রতিবাসীদের ডাকিতে গেলাম। তাঁহারা বলিলেন—তোমার মায়ের স্বভাব তেমন ভাল ছিল না। প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া লও, তবে আমরা ছুঁইব। মায়ের স্বভাবের দোষ

দেওয়াতে বড়ই রাগ হইল। কিন্তু সব জায়গা হইতে ঐ একই উত্তর পাওয়াতে দমিয়া গেলাম। তখন মনে পড়িল আমাদের অঙ্কের শিক্ষকের কথা। তাঁহার কাছে গিয়া সব কথা বলিলাম, তিনি তৎক্ষণাৎ আমাদের সঙ্গে আসিলেন। তাঁহার সাহায্যে ও পরামর্শে আমি ও গিরিবালা মাকে শ্মশানে আনিলাম ও দাহকার্য্য সমাধা করিলাম।

গিরিবালা সারাপথ কাঁদিতে কাঁদিতে আসিল। আমার চোখের জল শুকাইয়া গিয়াছিল। এখন পৃথিবীতে আমাদের আর কেহ রহিল না।

এইখানে একখানি খাতা শেষ হইয়াছে। সুরেশবাবু খাতাখানা বন্ধ করিয়া স্ত্রীর পানে চাহিলেন। চোখের জল মুছিয়া সুনীলা সুনন্দরীর আঁচল ভিজিয়া উঠিয়াছিল।



দ্বিতীয় খাতাখানি খুলিতে সুনীলাসুনন্দরী বলিলেন, তুমি একা একা পড়। আমি আর এ দুঃখের কাহিনী শুনিতে পারি না। আমার প্রাণ ফাটিয়া যায়।

সুনীলা চলিয়া গেলেন। সুরেশবাবু একা বসিয়া পড়িতে লাগিলেন।

আদ্যট।—মায়ের মৃত্যুর পর দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে। মা মারা গিয়াছেন ইহা যেন এখনও বিশ্বাস করিতে পারি না। স্কুল হইতে আসিবার সময় মনে হয়, বুঝি' মা বলিয়া ডাকিতেই মা আজিও দরজা খুলিয়া দিবেন। যে পিতার মর্শ্ব জানে না, মা হইতে বঞ্চিত হইলে তাহার যে কি কঠিন আঘাত লাগে তাহা আমার মতো অভাগারাই বুঝিতে পারিবে।

আশ্বিন।—এক রকম মাসগুলো কাটিয়া বাইতেছে। ক্লাসের দুই

চারিটি করিয়া ছেলেরা নিয়ম করিয়া ঠাট্টা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রমথ বলিয়া যে কুড়ি বছরের ছেলেটি তিন বৎসর হইতে ক্লাসে আছে, সেই সব চেয়ে বেশী জ্বালাতন করে।

বলে—মজা তো তুইই লুট্‌ছিস্ রে। এই বয়সে বোয়ের রাঙ্গা ভাত খেয়ে আসছিস্। তোর মতো বরাত কার ?

মার মৃত্যু সমন্ধে এই ভাবে কথা বলায় চোখে জল আসিল। বলিলাম আমি তোমার কি করিয়াছি যে আমার সম্বন্ধে তুমি এমন শত্রুতা কর! তোমার মা-বাপের সম্বন্ধে যদি তোমাকে এমন কথা বলি, তাহলে তুমি কি কর? প্রমথ তাচ্ছিল্য করিয়া উত্তর দিল—ওরে বলাবলি কথা ছেড়ে দে। আমার মা-বাবা—বিশেষ করে বাবা—যদি এখন অক্লা পান্, এখনি আমি ১৬ বৎসরের রাঙ্গা-বো বিয়ে করে এনে তোর সম্বন্ধে টেকা দিয়ে বসি। বাবাটা বলেছে কি জানিস্, যত দিন আমি ম্যাট্রিকুলেসন পাস না করতে পারি তত দিন বিয়ের কথা মুখে আন্তে পাবে না। মাটাও এমনি হাবা যে, একটা কথা কইলে না। আমিও বাবা মৌরুসি নিয়ে বসে আছি; কে পাশ করে দেখি। প্রমথ কি অসভ্য! দয়া মায়ার নামও ওর মনে নাই। ওর সম্বন্ধে কথাই কইব না।

কার্তিক।—প্রমথ হঠাৎ কাল ক্লাসে সকলের সম্মুখে বলিল, তোর বো তো বেড়ে, কাল তোদের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছিল দেখলাম।

ক্লাস স্কন্ধ সবাই হাসিতে লাগিল।

ক্লাস-টিচারের কাছে নালিশ করার তিনি একটু হাসিয়া প্রমথকে বারণ করিয়া দিলেন। স্কুল ছুটি হইলে প্রমথ আরও বাড়াইল। বাড়ী আসিয়া গিরিবালাকে খানিক বকিলাম। তাহার জন্মই তো আমাকে এত কথা সহ করিতে হইল! রাত্রে মনটা বড় খারাপ হইল। তাহার কি দোষ?

৩০ অগ্রহায়ণ।—এ মাসে টাকা আসিল না। বাংলা মাসের প্রথমেই বরাবর আসে। এ বার তো মাস শেষ হইল। যা কিছু মা বাঁচাইয়া ছিলেন প্রায় সবই তাঁহার শ্রাদ্ধে ব্যয় করিতে হইয়াছিল। কষ্টে কষ্টে মাসটা কাটিল।

পোষ—টাকা নাই একেবারেই। গিরিবালা সোনার দু'টি মাকড়ী বেচিয়া স্কুলের বেতন দেওয়া হইল ও কোন মতে এক বেলা খাওয়া চলিল। এবার কি হইবে? চিঠি লিখিব। কিন্তু কাহাকে লিখিব? যে পিতা স্কুলে করি টাকা পাঠাইয়া এতদিন সব কর্তব্য শেষ করিয়াছেন তাঁহাকে কি বলিয়া পত্র আরম্ভ করিব? তাহার উপর টাকা আসিত অল্প মোকের হাত দিয়া। তাঁহার তো ঠিকানা নাই জানি না।

বাৎসরিক পরীক্ষা হইয়া গেল।

ফাষ্ট ক্লাশে প্রমোশন পাইলাম, কিন্তু এবার ফোর্থ হইয়া গেলাম। বাড়ী ফিরিয়া খুব এক চোট কাঁদলাম। ফাষ্ট হইব, বৃত্তি পাইব, উচ্চ শিক্ষা পাইব, এসব উচ্চাশা আমার জন্মের মতো শেষ হইতে চলিল। গিরিবালা আমাকে সাহায্য দিতে আসিল। তাহাকে দু'হাত দিয়া ঠেলিয়া দিলাম। আমার দুঃখ সে কি বুঝিবে?

মাঘ।—স্কুল ছাড়িয়া দিলাম। যাহাদের সঙ্গে পড়িতাম, তাহাদের সহিত দেখা সাঙ্গাৎ একেবারে বন্ধ করিয়া দিলাম। কিন্তু খাইব কি! যে লেখাপড়া শিখিয়াছি তাহাতে তো চাকরী মেলা দায়। রেলের গুনিয়াছি এ লেখা পড়াতেও চাকরী হয়। কিন্তু এখান হইতে তো রেল বহু দূর। গিরিবালাকে একা রাখিয়া কি করিয়াই বা তত দূরে চাকরীর চেষ্টা করাই? মা যাইবার সময়ে শক্রতা সাধিয়া পাণ্ডে শিকল পরাইয়া গিয়াছেন। একবার তাঁহাদের সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করিব?

যেমন তিনি আমাদের দায়িত্ব ভুলিয়া আমাদের কষ্টের একশেষ

করিয়াছেন তেমনি তাঁহাকেও বিপদে ফেলিব ? সকলকে জানাইয়া দিব কেমন ভদ্র তিনি । কিন্তু মা যে মরিতে বসিয়াও বারন করিয়া গিয়াছেন । অন্ন চিন্তার চেয়েও যে তাঁহার স্বামীর মানের চিন্তা বেশী হইয়াছিল ।

তবে আর ভিক্ষার বুলি লইয়া তাঁহাদের দ্বারে যাইব না । কিন্তু পেট জ্বলিতেছে । অন্নের ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার ।

ফাল্গুন ।—অনেক চেষ্টা করিয়া শ্যামদাস কুঞ্জুর মুদিখানার দোকানে একটা কাজের যোগাড় করিলাম । বেতন মাত্র আট টাকা । ভবিষ্যতে কত বড় হইব কত না কল্পনাই করিয়াছিলাম । সব শেষ হইল । শেষটা কি না এক মুদিখানার দোকানের আট টাকা মাহিনার গোমস্তা !

ফাল্গুন ।—এক বৎসর এই মুদিখানার দোকানে কাজ করিয়াছি । শ্যামদাস জাতে ভিলি ।

দোকানে আরো তিন জন লোক আছে । বেশ বড় দোকান । এই এক বৎসর কি হাড় ভাঙ্গা খাটুনি খাটাইয়া লইয়াছে ! ভোর ৬টা হইতে বেলা ১২টা, আবার ২টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত একেবারেই ৯ঘণ্টা খাটুনি । খাতা লেখা মনিব শিখাইয়া দিয়াছেন ।

কেহ উপস্থিত না থাকিলে চাল ডাল ও ময়দাও বিক্রয় করিতে হইত । আমি দোকানে গেলে শ্যামদাস হাত তুলিয়া প্রণাম করিত । আবার প্রায়ই বেলা ৯টা ১০টার সময় বলিত, ঠাকুর এই বাজারটা চট করে আমাদের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এস তো । আসার সময় তোমার বাড়ী থেকে জল টল খেয়ে এসেছিলে ? ছেলে মানুষ এখন নী খেলে পারবে কেন ? কি দয়া !

চৈত্র । আর ডায়েরী লিখিয়া কি হইবে ? দোকানদারের প্রেরণার কি আর ডায়েরী লেখা শোভা পায় ! দু'জন ভাল লোকের সঙ্গে দেখা হয় না, দু'টো ভাল কথাও শুনিতে পাই না । আর কুঞ্জু মহাশয় ও তাঁহার দোকানের গোমস্তা কি মুখ খারাপই করে ! নিজের ছোট ছেলের সম্মুখেও

মুখ সামলাতে পারে না। এক একবার ভাবছি এ চাকরী ছেড়ে দিব। কিন্তু কি খাইব ?

তিন বৎসর পরে। পৌষমাস। উঃ কত পরিবর্তনই হইয়া গিয়াছে। এখন বাগানের সহিত অনায়াসে মিশিতেছি আগে ঘৃণা হইত। এখন আমি উগাদের মধ্যে একজন। সেদিন একটা চাষার-বৌ কি কিনিতে আসিয়াছিল ; কুণ্ড মহাশয়ের ভাইপো তাহার সহিত এমন বিশ্রী রসিকতা করিল, সকলেই হাসিয়া উঠিল। আমিও যোগ ছিলাম। প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা। ছি! কি অবনতিই আমার হইয়াছে। ২০ বৎসর বয়স হইয়াছে আমার। কোথায় উন্নতি করিব কত! তা নয় কি হইলাম! আর ডায়েরী লিখিয়া কি করিব? কেবল তো কলঙ্কের কাহিনী।

ভাবিয়াছিলাম আর কখন ডায়েরী লিখিব না কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া কি করিব। কাল হইতে চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছি।

ছাড়িয়া দিয়াছি ঠিক নয়। ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছি। কুণ্ড মহাশয়ের ভাইপো একদিন আনাকে তাগাদায় পাঠাইবার জন্য ডাকিতে আসিয়াছিল। সে সময় উঁকি মারিয়া গিরিবালাকে দেখিয়া গিয়াছিল। তারপর শুনিলাম, আমি দুপুরের পর, সন্ধ্যার পর যখন দোকানে থাকি সেই সময় দুই দিন বাড়ী চড়াও করিয়াছিল। গিরিবালা তাড়াতাড়ি দুয়ার বন্ধ করিলে দুয়ারের কাছ হইতে দু'চারিটা কুৎসিত কথা বলিয়া গিয়াছিল। তাহার অনুগ্রহ হইলে আমার আর কোন দুঃখ থাকিবে না এ ভরসাও দিয়াছিল। বাড়ী আসিলে গিরিবালা কাঁদিয়া ভাসাইয়া। পর দিন একটু চালাকি করিলাম। সন্ধ্যার আগে একটা ছুতা করিয়া বাড়ী আসিয়া একগাছা লাঠি হাতে ঘরের পিছনে জানালার একটু কাছে দাঁড়াইয়া রহিলাম। নির্লজ্জ গোপীনাথ সে দিন আসিয়া দেখিল, জালালা খোলা।

আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া বার কয়েক আশ্তে আশ্তে শীঘ্র দিয়া গিরি গিরি বলিয়া ডাকিল। রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। যেন ওর চোদ্দ পুরুষের গিরি। লাঠি গাছ বাগাইয়া ধরিয়া পায়ের গোছে এক বাড়ি! বাবাগো বলিয়া গোপীনাথ চীৎকার করিয়া সেখানে পড়িয়া গেল, আমি তাহার উপর তাহার গালে এক চড় লাগাইয়া পিছন দিয়া দৌড়িয়া বাড়ীর ভিতরে আসিলাম। দুই চারিজন লোক জমা হইয়াছিল। তারপর সে গৌড়াইতে গৌড়াইতে কোন রকমে বাড়ী পৌঁছিয়াছিল। প্রহার সাংঘাতিক হয় নাই। তবে ২।৪ দিন আর পাড়ায় পাড়ায় সে সাধুবৃত্তি করিয়া বেড়াইতে পারিবে না।

ইহার পর আর উহাদের দোকানে গিয়া কি করিয়া চাকরী করিব? সেদিন হইতে ওদের দোকানের চাকরী শেষ করিলাম। ১২ দিন কাজ করিয়াছি। একদিনেরও মাহিনার আর আশা নাই কুণ্ড মহাশয়ের কাছে।

চৈত্র। জমিদারবাবুদের সখের থিয়েটার আছে। তাহারা আমাকে একদিন ডাকিয়া লইয়া গেল। বলিল, আমি থিয়েটার করিলে আমাকে সেখানে থাকিতে দিবে ও ১০ টাকা করিয়া মাহিনা দিবে। আমি স্বীকৃত হইলাম। গৌপ কামাইয়া নায়িকা সাজিতে হইবে। রিহার্সেল দিতে বড়ই লজ্জা করিত। ক্রমশঃ সহিয়া গেল। তাহারা চরস গাঁজু, কখন কখন মদ পর্য্যন্ত খাইত। প্রথম প্লের দিন আমাকে একটু মদ খাওয়াইয়া দিল। ধীরে ধীরে আমারও সব রকম নেশা অভ্যাস হইতে লাগিল। আর ডায়েরী লিখিব না। এই শেষ।

এক বৎসর পরে। আষাঢ়। ৭ তারিখ। একটি কন্যা ভ্রমগ্রহণ করিল। পোড়ারমুখী, কেন মরিতে এ বাড়ীতে আসিলি? বাবুদের সখ কমিতেছে। এর পর কি খাওয়াইব?

ইহার পর আর ডায়েরী নাই।

নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুরেশবাবু খাতা বন্ধ করিলেন, এই হতভাগ্যের ঘরের ইতিহাসটুকু বৃত্তিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি ভাবিলেন হায়, অভাগা সঞ্জীব।

৬

সাত মাসের একটা ছেলেকে কোলে হইয়া ফণীন্দ্রের স্ত্রী উষারানী শাশুড়িকে দেখাইয়া এই কথা বলিল। ছেলেটা সুন্দর ছুঁই পুষ্ট। মাথার চুল সুন্দর, সুন্দর, ও কুঞ্চিত হইয়াছে। ক্রু'টি কে যেন কাজল দিয়া আঁকিয়া দিয়াছে। দুই হাতে শিশুকে মুখের সামনে তুলিয়া ধরিয়া মাথাটি একবার নাড়িয়া খোকার পেটের উপর ঈষৎ চাপিয়া ধরিতেই খোকা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বৈশাখের মধ্যাহ্ন। সুশীলাসুন্দরী দিনে না ঘুমাইয়া ঘরের মেঝেতে সতরঞ্চির উপর একটা শীতলপাটি বিছাইয়া চোখে চশমা লাগাইয়া একখানা বাংলা মাসিকপত্র পড়িতেছিলেন। পুত্রবধু আসিতেই বই হইতে মুখ তুলিয়া পোলের পানে চাহিলেন। শিশুর হাসি দুই জনে আনন্দোজ্জ্বল মুখে দেখিতে লাগিলেন, এই এক এক টুকরা হাসি যেন পারিজাতের এক একটি পাপড়ি। কোন নন্দন কানন হইতে কি করিয়া এ ধরায় উড়িয়া আসে আবার মিলাইয়া যায়।

সুশীলাসুন্দরী বই বন্ধ করিয়া দুই হাত পাতিয়া পোলকে একোলে লইতে গেলেন। পোল একটু খানি চাহিয়া মুখ ফিরাইয়া মায়ের কাঁধে মুখ রাখিল।

উষা হাসিয়া বলিল—চশমা খুলে রাখুন আগে।

তাইত ছেলের আবার সব দিকে দৃষ্টি আছে, বলিয়া সুশীলাসুন্দরী চশমা খুলিয়া খাপের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। এবার হাত পাতিতেই খোকা ঝাঁপাইয়া ঠাকুরমার কোলে গেল। ঠাকুরমা আদরে চুম্বনে ডুবাইয়া খোকাকে কোলে বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, “হাঁ বোমা! ফণী তোমাকেও চিঠি দিবে না? আমাকে তো অনেক করে বকেছে।”

বধু সলাজে হাঁ বলিয়া জিজ্ঞাসু নয়নে শাস্ত্রির পানে চাহিল।

সুশীলা বলিলেন—ফণীকে লিখেছিলাম, দিন কয়েকের জন্য তোমাদের নিয়ে যেতে। গরনের দিন, একেই কিছু খেতে পারে না, তার ওপর ঠাকুরের রান্না সে কি আর মুখে করতে পারে? দেখনা পড়ে চিঠিখানা, বালিশের নীচে আছে।

উষা নির্দিষ্ট স্থান হইতে তখন চিঠি লইয়া মনে মনে পড়িতে লাগিল।

ফণী লিখিয়াছিল, খোকা ও উষাকে তাহার কাছে পাঠাইবার জন্য পিতামাতার এত ব্যস্ত হইবার কারণ সে বুঝিতেছে না। উষা কি তাঁহাদের কোন প্রকারে অসন্তুষ্ট করিয়াছে?

বিদেশে তো অনেক লোকেই থাকিতেছে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়জন ঠাকুরের রান্না খাইয়া ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছে? খোকাকে ছাড়িয়া থাকিতে যে তাঁহাদের কষ্ট হইবে এ কথাটা কি এতদিনে সে বুঝে নাই? তাহার পিতামাতা কি যত্নে কি মেহে তাহাদের মানুষ করিয়াছেন সে কথা ভুলিবার সময় এখনও তাহার হয় নাই। ছুটি পাইলে যখন সে আসিতেছে তখন, মা বড় কষ্ট বলিয়া কেন এত ব্যাকুল হন! নিজে ত সে বাপ মায়ের সেবা করিতে পারিতেছেনা, যারা কাছে থাকিতে পারে তারাও যদি না কষ্টের তা কতখানি অন্য় হইবে।

পরিশেষে ফণী লিখিয়াছে, মা যেন না ভাবেন তাঁহার মনের ইচ্ছা খোকাদের আসা, কিন্তু সে কথা লজ্জায় বলিতে পারিতেছে না; মা কি

ভুলিয়া গিয়াছেন যে, আজ পর্য্যন্ত কোন কথা সে মায়ের কাছে গোপন করে নাই ?

চিঠি শেষ করিয়া খামের মধ্যে পুরিয়া উষা পুনরায় বালিশের নীচে রাখিয়া দিল ।

সুশীল বলিলেন, “দেখলেতো বোমা চিঠি । কথা অমন গুছিয়ে বলতে কেউ পারবে না ।” উষা মনে মনে বলিল, তবু তো মা আমার চিঠিখানি দেখেন নি ।

প্রকাশে বলিল—আমার চিঠিতে আবার এর চেয়ে বেশী আছে । এই দেখুন মা এই পাতাটা পড়ে ।

বলিয়া বদ্বান্তরালে লুক্কায়িত একখানি পত্র বাহির করিয়া একটা পাতা মুড়িয়া শাশুড়ির হাতে দিয়া উষা পলাইল ।

সুশীলাসুন্দরী সুধু নিদ্দিষ্ট পাতাখানি পড়িলেন ।

ফণী লিখিয়াছিল—তুমি যে কোন অসন্তোষ প্রকাশ কর নাই তাহা আমি খুঁবি জানি । হয়ত তোমার মনে কোন দিন এই ভাব উদয় হইয়া থাকিবে, কলিকাতায় থাকিলে বেশ হইত, মুখে সে দিন হয়ত তাহারি একটা ছাপ পড়িয়া গিয়াছিল ; হয়ত বা একটা নিঃশ্বাসও জ্বোরে বহিয়াছিল । তোমাকে তো কতবার বলিয়াছি, আমার মায়ের চোখে এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে । মানুষের মুখ দেখিলে তিনি অন্তরের কথা বুঝিতে পারেন । হয়ত বা এই করিয়া মার কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছ ।

আমার এই অনুমান ভুলও হইতে পারে । আর যদি ঠিক হয় তো সে ~~আমার~~ মন হইতে দূর করিও ।

আমি পিতামাতার সেবা করিতে পারিতেছি না, তুমি করিতেছ । আমার প্রাণ যাহা করিতে চায় তাহাই তোমার দ্বারা হইতেছে । ইহাতে আমাদের প্রাণের মিলন অচ্ছেদ্য ও নিবিড় হইতেছে । যে ভালবাসার

মধ্যে সংযম নাই, তাহার কল্যাণও নাই ও তাহার শেষ রক্ষা হয় না। ইহাতে আমাদের দু'জনেরই মত। অন্য সব কর্তব্য অবহেলা করিয়া আমরা দু'জনে একত্র থাকিব ইহা কি অসংযম নয় ?

এইটুকু পড়িয়া পুত্রগর্বে সুশীলাসুন্দরীর হৃদয় ভরিয়া উঠিল ; ছল ছল চক্ষে পত্রের সুন্দর মুক্তার মতো অক্ষরগুলির দিকে মেহভরে খানিকক্ষণ চাহিয়া অন্তরালে নিকটে কোথাও লুক্কাইত পুত্রবধূকে ডাকিলেন, “বোমা, শোন মা।”

৭

শ্রাবণের অপরাহ্ন। সকাল হইতে আজ বর্ষা নামিয়াছে। এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যায়, খানিকটা বন্ধ থাকে। আবার গুঁড়ি গুঁড়ি আরম্ভ হয় ; শেষে আবার এক পশলা জল। এইরূপে সমস্ত দিন কাটিয়াছে।

অপরাহ্নে কিছুক্ষণ বর্ষণ বন্ধ আছে। পথ ঘাট অত্যন্ত পিছল। গ্রামের লোক খালি পায়ে পথ চলিতেছে। দূরের পথিক কেহ খালি পায়ে, কেহ জুতা ও মাথা সাবধানে ছাতার আড়ালে বাঁচাইয়া বাইতেছে, দূরে কোথাও বৃষ্টি হইতেছে তাই মাঠের মাঝখান দিয়া সে জায়গাখানি কাপসা দেখাইতেছে। সকলেই ব্যস্ত হইয়া চলিতেছে, ভাবিতেছে এই পথটুকু শেষ করিয়া বাড়ী পৌঁছিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হইব—তা হোকনা কেন বাড়ী জীর্ণ ও পুরাতন, আর হোকনা তাহার ছাদ ছিদ্রবহুল।

আজ ফণীন্দ্র কলিকাতা হইতে আসিবে। সন্ধ্যার পূর্বেই আসিবার কথা। সুরেশবাবু এখনও কোর্ট হইতে ফিরেন নাই। সুশীলাসুন্দরী

এক একবার আকাশের দিকে চাহিতেছেন আর ভাবিতেছেন আর এক পশলা বৃষ্টি আসিবার আগেই ফণী যদি পৌঁছায় তবে ভাল হয়।

উষা মনে মনে আকাশকে গালি পাড়িতেছিল। বৃষ্টি আর দিন খুঁজিয়া পাইল না তাই আজিকার দিন বুকিয়া ঘোর করিয়া আসিল। মুখে কিন্তু উষা কিছুই বলিতে পারিতেছিল না।

সন্ধ্যার একটু পূর্বে সুরেশবাবু কাছারি হইতে ফিরিলেন। ফণীন্দ্র তখনও পৌঁছে নাই শুনিয়া বলিলেন—“পথে বোধ হয় জলের জন্ম কোথাও দেবী করছে। নইলে তো এতক্ষণ পৌঁছে যাবার কথা।”

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে সুনীলাসুন্দরী চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। উষা নানা ছুতায় ঘর বাহির করিতে লাগিল। শেষটা মাথা ধরিয়াছে বলিয়া বিছানায় খানিকক্ষণ পড়িয়া রহিল। সুরেশবাবু তাঁহার এক চাপরাশীকে ডাকিয়া একটু আগাইয়া দেখিতে বলিলেন।

আস্তে আস্তে উষার পায়ে কে সুড়সুড়ি দিতেই উষা ‘কে’ বলিয়া পা গুটাইয়া উঠিয়া বসিল। মণীন্দ্র হাসিয়া বলিল, “চুপ-বোদিদি! আমি তোমার মাথা ধরা সারিয়ে দেব।”

উষা লজ্জা পাইয়া হাসিয়া বলিল, “কি করে?”

মণীন্দ্র পরিহাসটাকে সহজ করিয়া আনিয়া কহিল—“দাদা এখনও পৌঁছনু নি বলে তোমরা ভাবছ তো! আমি এগিয়ে গিয়ে তোমাকে খবর এনে দিচ্ছি।”

উষা বলিল, “হীকু চাপরাশী তো গেছে ঠাকুরপো! তুমি আর কেন যাবে?”

মণীন্দ্র মুহূ হাসিয়া বলিল—“তোমার হীকু ফিরে আসবার ঢের আগে আমি খবর দেব। আমি সাইকেল করে যাব।”

“এ বৃষ্টিতে অন্ধকারে?”

“তা হোক ; আলো থাকবে তার আর ভয় কি !”

“বাবা কি বলবেন ?”

বৌদিদির নিবুন্ধিতায় মণীন্দ্র হাসিয়া বলিল, “কাউকে বলে যাব না । তাইতো তোমাকে চুপি চুপি বলতে এলাম । আমার পড়বার ঘরে cycle আছে, আমি সেখান থেকে আস্তে আস্তে চলে যাব । তুমি এক একদিন আমার সঙ্গে বসে যেমন পড়াশুনো কর, সেই রকম করগে, তাহলে কেউ কিছু ভাববেন না ।”

“এখন যদি তোমার মাষ্টার আসে !”

“আজ ছুটি, আজ তিনি আসবেন না । তুমি একটু পরেই যেয়ো যেন । আমি আধঘণ্টার মধ্যেই তোমাকে খবর দেব । বাইরের ঘরেই থেকে ।” বলিয়া মণীন্দ্র চলিয়া গেল ।

পড়বার ঘরে stand হইতে cycle খানা নামাইয়া লইয়া ছোট লঠনটি তাহাতে লাগাইয়া সকলের অজ্ঞাতসারে চট করিয়া বাহির হইয়া গেল । আলো পরে জ্বালিবে ভাবিয়া দেশলাই পকেটে রাখিয়াছিল ।

বৌদিদির মাথাধরার কারণ অনুমান করিয়া মণীন্দ্র ঔষধ ব্যবস্থা করিবার জন্ত এইরূপে বাহির হইয়া গেল ।

আধ ঘণ্টার আগেই cycle হইতে নামার ও cycle উপরে উঠানোর শব্দ শুনিয়া উষা ভিতর হইতেই জিজ্ঞাসা করিল, “ফিরলে ঠাকুরপো ?”

“হ্যাঁ ফিরেছি—তবে ঠাকুরপোর দাদা !”

উষা সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল—cycle হাতে ছয়ারের সম্মুখে মণীন্দ্র হাস্যমুখে দাঁড়াইয়া ।

“তুমি cycle করে’ এলে, ঠাকুরপো কই ?”

“সে গাড়ীতে আছে । তোমাকে বুঝি সে এখানে বসিয়ে রেখে গেছে ?”

“হ্যা, বললে আমি তোমাকে একগনি খবর দিচ্ছি।”

“দুষ্ট আমাকে গিয়ে বললে—দাদা, আমি তোমার গাড়ীটার চড়েনিই ; তুমি cycle খানায় যাও না। যখন cycleএ উঠেছি তখন বললে পড়বার ঘরে cycle খানা তুলে রেখ—দুয়োর ভেজান আছে। দুষ্ট দেখেছ !”

পরিহাসপ্রিয় স্নেহ-প্রবণ ভাইটির কথা মনে করিয়া ফণীন্দ্র হাসিয়া উঠিল। উষা মনে মনে বলিল ঠাকুরপোর কি বুদ্ধি !

ফণীন্দ্র বলিল—“চল ভিতরে যাই।”

“রোসো আমি আগে পালাই।”

বলিয়া উষা আনন্দে ও লজ্জায় আগেই ছট দিল।

৮

ফণীন্দ্র আসিয়া প্রণাম করিতেই স্নানীলাসুন্দরী বলিলেন—“এসেছি বাবা ! বাঁচলাম। আমরা ভেবে মরছিলাম কেন এত দেরী হচ্ছে !”

সুরেশবাবু বলিলেন—“হীকু খুঁজতে গেছে দেখা হয়েছে ? কিন্তু কই, ভোয়ার গাড়ীর তো শব্দ শুন্তে পেলাম না ?”

ফণীন্দ্র একটু হাসিয়া বলিল, “গাড়ী এখনও পৌঁছায়নি যে বাবা ! তা কি করে শব্দ পাবেন।”

বিস্মিত হইয়া সুরেশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন, ‘তুমি কি তাহলে গাড়ী ছেড়ে হেঁটে এলে ?’”

ফণীন্দ্র বলিল—“মগি যে চুপে চুপে cycle নিয়ে আমাকে আগাতে গেছিল। সে বললে—সকলে ভাবছেন কিন্তু আমাকে কেউ একটিবার

বললেন না যে cycle করে গিয়ে দেখে এস। তারপর সে আমাকে cycle করে পাঠিয়ে দিয়ে সে গাড়ীতে আসছে।”

সুরেশবাবু ও সুনীলাসুন্দরী উভয়ে হাসিয়া উঠিলেন। সুনীলা বলিলেন—“দেখেছ একবার ছেলের বুদ্ধি! সব তাতে কি করে’ যে বেড়ায়!”

সুনীলাসুন্দরী পুত্রের কাপড় জানায় হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া কহিলেন—“ভিজ্ঞে কাপড় ছেড়ে ফেল বাবা। হাত মুখ ধুয়ে নে। চা খাবি তো?”

সুনীলাসুন্দরী উঠিতে গেলেন। তাঁহার চিরদিনকার অভ্যাস, ছেলেদের কোন কিছু দরকার হইলেই কাহাকেও আদেশ না করিয়া তিনি নিজেই তাহা করিতে যান।

ফণী বলিল—“মা তুমি তা বলে চা করতে যেও না।”

সুনীলা হাসিয়া বলিলেন—“কেন রে তাতে দোষ কি? চাওতো খাবার জিনিস।”

“তা হোক মা। তুমি চা তৈরী করবে কি চা হাতে করে নিয়ে আসবে—এ মনে হলে যেন কি রকম হয়। বয়সে ও সম্পর্কে যারা ছোট তারাই চা করবে।”

সুরেশবাবু এতক্ষণ হাসিমুখে মাতা ও পুত্রের বাদ প্রতিবাদ শুনিতে- ছিলেন। স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—“আচ্ছা বৌমাকে বলগে তৈরী করতে। হয়ত বা তিনি এতক্ষণ আরম্ভই করেছেন।”

ফণী পৃহাস্তর হইতে বস্ত্রাদি পরিবর্তন করিয়া হাতমুখ ধুইয়া পিতার কাছে আসিয়া বসিল।

বাড়ীর সম্মুখে একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। ফণী বলিল—“মণি এল বোধ হয়।”

একটু পরে হীরু চাপরাণী বাহির হইতে নত হইয়া বলিল—“হুজুর বড়বাবু ছোটবাবুর সাইকেলে আগেই এসেছেন। ছোটবাবু আর আমি গাড়ীতে একসঙ্গে এলাম। জিনিসপত্র সব তোলা হয়েছে।”

সুরেশবাবুর আজ্ঞা পাইয়া হীরু চলিয়া গেল। সুরেশবাবু হাসিয়া বলিলেন—“হীরু খুব আগে নতুন খবর দিয়ে গেল।”

সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

একটু পরেই মণি অতি শান্ত ছেলের মতো ঘরে আসিয়া বসিল।

সুশীলাসুন্দরী বলিলেন—“দেখছ গা কি শান্ত শিষ্ট ছেলে আমার। যেন কিছুই জানে না, দাদার আসার খবর পেয়ে এই মাত্র আসছে।”

মণি মায়ের দিকে চাহিয়া মুদু হাসিয়া মাথা নীচু করিয়া রহিল। কান দু’টি রহিল পিতার কথার দিকে। পিতাকে বলিয়া যাওয়া উচিত ছিল ইহা মণি বাহির হইয়া অবধি বুঝিয়াছেন। কাজ ও কাজের উৎসাহ সাক্ষ হইয়া গেলে যেটুকু অণ্ডায় হইয়াছিল তাহাই মনে হইতেছিল।

সুরেশবাবু বলিলেন—“মণি তুমি কাজ ভালই করেছ; কিন্তু আমাদের কাউকে বলে যাওয়া উচিত ছিল। তোমার যদি দেবী হ’ত আমাদের ভাবনা আরও বেড়ে যেত!”

মণি ধীরে ধীরে বলিল, “আমি বৌদিদিকে বলে গেছলাম।”

সুরেশবাবু কিছু বলিবার আগেই উষা ও শান্তি খাবার ও এক এক পেয়ালা চা আনিয়া দুই ভাইয়ের সম্মুখে রাখিল।

শ্বশুরকে, উষা জিজ্ঞাসা করিল, “বাবা, আপনাকে এক পেয়ালা চা এনে দেব?”

সুরেশবাবু হাসিয়া বলিলেন—“না, মা!”

“একটু বেশী দুধ চিনি দিয়ে এক পেয়ালা দিই না বাবা!”—উষা মিনতি করিয়া কহিল।

শান্তি বলিল—“বৌদিদি বলছিলেন, আজ সুন্দর চা হয়েছে। আপনি খান তো বেশ হয়।”

সুরেশবাবু সম্মেহে পুত্রবধূর পানে চাহিয়া বলিলেন—“তাই নাকি মা! তাহলে অবিশিষ্টই তোমাদের চায়ের ঐ যে কষা স্বাদটা থাকে তাকে তোমরা খুব সুন্দর বলে থাক—অর্থাৎ ট্যানিক এসিডটা আমি সহিতে পারিনে।”

উষা তখনি গিয়া শ্বশুরকে চা আনিয়া দিল। তিনি তাহা আরও খানিক ঠাণ্ডা করিয়া চুমুক দিয়া নিঃশেষ করিলেন।

উষা জিজ্ঞাসা করিল, “বাবা, ভাল লাগল না?” সুরেশ বাবু বলিলেন, “বেশ লেগেছে মা!”

বাড়ীতে উষা ব্যতীত কেহই নিয়ম করিয়া চা খান না, তবে উষার আগ্রহ অনুরোধে সকলকেই মাঝে মাঝে চা খাইতে হয়।

এই চা খাওয়ার একটা ইতিহাস আছে।

উষার বাপ সিমলায় কাজ করিতেন। সেখান হইতে চায়ের অভ্যাসটি উষা পূরাদস্তুর অভ্যাস করিয়া আসিয়াছিল। এই যুগে এবং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীতে যে চায়ের চলন নাই, একথা উষার পিতা ধারণা করিতে পারেন নাই। সেজন্য উষার শ্বশুরকে আর এ কথা বলা দরকার বিবেচনা করেন নাই।

এদিকে উষার চা খাওয়ার কথাটা কেহই চট্ করিয়া ধরিতে পারিত না—যদি না মনি এ সত্যটি আবিষ্কার করিয়া ফেলিত। একদিন এক অতিথির জন্ত বাড়ীতে চা তৈয়ারি হইতেছিল আর উষা লুকনেত্রে তাহারি পানে চাহিয়া হয়ত বা জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল। মনি উষাকে অন্তরালে ডাকিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করেন—“বৌদি চা খাবে?” উষা আর সেদিন সত্য গোপন করিতে পারে নাই। সেই দিনই মনি

মাকে চুপি চুপি বলে যে, তাহার বৌদিদির চা খাওয়ার অভ্যাস আছে। ইহারি ফলে আর কেহ না খাইলেও সুধু উষার জন্ম সেই দিন হইতে চা হইয়া থাকে। উষা ইহার জন্ম প্রথমটা সংকুচিত হইয়া থাকিত, কিন্তু শাশুড়ীর স্নেহে ও ঔদার্য্যে ক্রমশঃ সে সংকোচ দূর হইয়াছিল। সুশীলা ভাবিতেন, এতদিন মুখ ফুটিয়া চায়ের কথা না বলিতে পারিয়া বাছা কি কষ্টটাই পাইয়াছে।

উষার অনুরোধে মণি প্রায়ই চা খাইত। সুশীলাসুন্দরীও একেবারে নিষ্কৃতি পাইতেন না। আজ বর্ষা, কাল ঠাণ্ডা বেশী এইরূপ একটা না একটা কারণ দেখাইয়া মাসের মধ্যে অন্ততঃ ৭।৮ দিন তাঁহাকে চা না খাওয়াইয়া ছাড়িত না।

আজ যখন চা খাওয়া উপলক্ষ্যে সকলে কেহ কাছে কেহ বা দূরে একত্র হইলেন সুরেশবাবু একবার সকলের পানে তৃপ্ত চক্ষে চাহিয়া দেখিলেন।

ইন্দুকে কাছে ডাকিয়া আদর করিয়া সুরেশবাবু বলিলেন, “এই তোমার বড়দাদা ; প্রণাম কর।”

ইন্দু ফণীকে দেখিয়া অবধি এদিকে আসে নাই। সুরেশবাবুর ডাকে অতি সংকুচিত ভাবে আসিয়া ফণীকে প্রণাম করিল।

— ফণী মেয়েটির মাথায় হাত দিয়া—আদর করিয়া বলিল—“বেশ মেয়েটি তো। ইন্দু নামটিও বেশ।”

এই মিষ্ট কথা ইন্দুকে যেটুকু আনন্দ ও উৎসাহ দিয়াছিল তাহা তাহার সংকোচের আড়ালেই লুকাইয়া গিয়াছিল। প্রণাম করিয়া সে ধীরে ধীরে উষার কোলের কাছটিতে গিয়া বসিল। উষাকেই সে এ সংসারে সব চেয়ে আপনার বলিয়া চিনিয়াছিল!

পিতৃমাতৃহীন সুন্দর মেয়েটি, সে অত্যন্ত নির্ভরতার সহিত তাহার স্ত্রীর

কাছে গিয়া বসিল এ দৃশ্যটি ফণীর চক্ষে বড়ই ভাল লাগিল। গভীর ভক্তির সহিত সে পিতার পানে চাহিয়া বলিল—“বাবা, ইন্দুকে এনে আপনি খুব ভাল করেছেন। এ ছাড়া এর আর কোন প্রতিকার ছিল না।”

তার পর পিতা পুত্র অনেক কথাই হইল। মাঝে মাঝে অন্য সকলে কথায় যোগ দিতেছিলেন।

ফণী একবার মণির দিকে চাহিয়া বলিল—“অনেক দিন তোমার গান শুনি নি মণি। একটা গান গাও তো, ভাই।”

সেই ঘরেই হারমনিয়ম ছিল। মণি হারমনিয়মের কাছে গিয়া একটি ইমনের সুর বাজাইল। তারপর শারোদোৎসবের একটি গান ধরিল। মিষ্টকণ্ঠের সুন্দর গান সকলেরই বড় সুন্দর লাগিল।

ইহার পর মণির শেখান একটি গান শান্তি গাহিল। সেটি বাংলায় রচিত একটি স্তব।

মণি বলিল—“দাদা তুমি একটি স্বদেশী গান গাওনা।”

ফণী একটি গান মনে করিয়া হারমনিয়মের কাছে আসিল। গানের সুর বাজিতেই সবার বক্ষে রক্তধারা যেন দৃপ্ত গতিতে ছুটিল। ফণী গাহিল—

ধন-ধান-পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা
সে যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা !

যাহাকে ছোট করিয়া দেখিয়াছি তাহাকে কত বড় মনে করা যায়,
যাহাকে তুচ্ছ করিয়াছি তাহা কত মহৎ হইতে পারে, মেঘের রং, গাছের
ডাল, পাখীর ডাক, মাঠের ঘাস ও কঠিন পাহাড় এ সমস্ত এক মুহূর্তে

কত প্রিয় ও বাঞ্ছিত হইতে পারে এ গানটি একটিবার শুনিলেই তাহা বুঝা যায়।

মণি দাদার এই গান উৎকর্ণ হইয়া একাগ্রচিত্তে শুনিত শুনিত তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। গান শেষ হইয়া গেল, সকলে অন্তদিকে মন দিল, তখনও মণি একদৃষ্টে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। ফণী জিজ্ঞাসা করিল—“কেমন গান মণি?”

মণি চমকিয়া উঠিল। এতই একমনে সে গানের কথা ভাবিতেছিল যে চট করিয়া মণি কোন উত্তর দিতে পারিল না। দ্বিতীয়বার ঐকথা দাদা জিজ্ঞাসা করাতে মণি ধীরে ধীরে বলিল—“খুব সুন্দর দাদা! এ গানটা আমার শিখিয়ে দাও দাদা!”

ফণী বলিল—“বেশ তো, শেখো।” মণি উৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইল। সুরেশবাবু কাছে ছিলেন বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন—গান শুনিত শুনিত মণির চোখে ২৩বার জল আসিয়াছিল।

২

আহাৰাদি শেষ করিয়া উষা যখন ঘরে আসিল, তখন খুব বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। ধারা খুব জোরে না হইলেও বর্ষণের একটি অবিশ্রান্ত শব্দ ঘরের ভিতর আসিয়া ভিতরকার ঈষৎপু ও কোমল শব্দা এবং শান্ত-নিস্তরুতাকে মনোরম ও লোভনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। বাহিরে গাঢ় অন্ধকার, আকাশের বুক চিরিয়া বিদ্রাৎ ছুটিতেছিল। পক্ষণেই গুরু গুরু মেঘ গর্জন শুনা যাইতেছিল। বাতাস ক্ষণে ক্ষণে উদ্দাম হইয়া দ্বার ও বাতায়ন পথে আর্ভ পথিকের মতো যেন করাঘাত করিয়া আশ্রয় প্রার্থনা জানাইয়া যাইতেছে।

পিছনের দিকে একটি উজ্জ্বল আলোক রাখিয়া একখানি ইজি চেয়ারে বসিয়া ফণীন্দ্র পড়িতেছিল। পালঙ্কের একধারে তাহাদের শিশু-পুত্র তপ্ত কোমল শয্যায় নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা যাইতেছিল। উষা ঘরে প্রবেশ করিতেই ফণীন্দ্র বইখানি আঙ্গুল দিয়া বন্ধ করিয়া মিষ্ট হাসিয়া বলিল “এস।”

উষার পরনে মেঘরঙের একখানি শাড়ী, হাতে সুপরিষ্কৃত একটি বাটিতে খোকার জন্ম দুধ।

দুধের বাটিটি একটি টিপায়ের উপর রাখিয়া উষা বলিল—“এখনও যুমাওনি।”

ফণী হাসিয়া বলিল—“এত দূরদেশ থেকে আমি বুঝি যুমুতে এসেছি!”

উষা মূহু হাসিয়া বলিল—“পড়তে এসেছ বুঝি?”

“এই যে পড়া রইল এখন বিছানায় তোলা। ঘরে সিকে থাকলে সিকের রাখতাম।”

বলিয়া বইখানি পাশের পালঙ্কের উপর রাখিয়া ফণীন্দ্র হাসিয়া উঠিল ও উষাকে ধরিয়া পাশের চেয়ারখানিতে বসাইল।

“তারপর খবর কি বল?” ফণীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল।

“তা ভাল! তুমি কি মক্কেল পেলে নাকি?”

“মক্কেল তো বটে। একেবারে সেরা মক্কেল বার কাছ থেকে ফন্দমা না পেলে প্রাণ বাঁচান দায় হয়ে ওঠে।” বলিয়া ফণীন্দ্র স্নেহে উষার দক্ষিণ হাতখানি আপনার হাতের মধ্যে টানিয়া লইল।

উষা জিজ্ঞাসা করিল—“আমার চিঠি পেয়েছিলে?”

—হাঁ।

—উত্তর দিলে না যে?

—উত্তর দিলে আজ চিঠি এখনও চুয়াডাঙ্গায় থাকত। কাল দু'জনে

একসঙ্গে পড়তে পেতাম বটে ! আচ্ছা মা আমার চিঠি পেয়ে রাগ করেননি ?

—না ।

—তুমি রাগ করনি ?

—না ।

—আচ্ছা তুমি সত্যি বলত, তোমাকে যদি কল্কাতা নিয়ে যাই এখানকার জন্তু মন কেমন করে না ?

—করে ।

—কার জন্তু ?

—মা, বাবা, ঠাকুরপো, আর আজকাল আর একজন হয়েছে—ইন্দু ।

—ইন্দু বুঝি তোমার কাছেই বেশী থাকে ?

—হ্যাঁ খুব বেশী । সে আমায় সত্যি ভালবাসে ।

—আচ্ছা, এখানে থাকলে কারুর জন্তু মন কেমন করে ?

—জানিনে ।

—বলনা !

—তোমার কি মনে হয় ?

—আমি জিজ্ঞাসা করছি । উত্তরের পালা তোমার ।

—তুমি তো জান ।

—তবু বলনা । একটীবার শুনি ।

—করে ।

—মুখ নীচু কলে যে ? রাগ হল ?

—জিজ্ঞাসা কলে মনে হয়, তুমি বিশ্বাস করনা বা জাননা তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছ ।

“—না তা নয় । সে গানটী তোমার ভাল লাগে বেশী, শোনা গান

হলেও কি তুমি সে গান শুনতে চাও না আর? আমারও মনে এক এক সময় বড় কষ্ট হয়। কিন্তু এইটুকু ভেবে আমার সে কষ্ট দূর হয় যে—তুমি হয়ত যে সময়ে আমার কথা ভাবছ, আমিও সেই সময়ে তোমাকেই মনে করছি। দু'জনের সত্যিকার মিলন হচ্ছে। তোমার ব্যবহারে মা বাপ বড় সুখে আছেন এ সব ভাবলে আমার বড় তৃপ্তি হয়। তারপর যখন তোমার কাছে আসব ভাবি, সেদিন থেকে আনন্দের শুরু হয়। আর আজকের আনন্দের তো তুলনাই নেই!”

বলিয়া ফণীন্দ্র উষার হাতখানি আপনার কোলের উপর রাখিয়া প্রকৃত ভালবাসার নিঃস্ব দৃষ্টিতে উষার পানে চাহিল।

একবার খানিকক্ষণের জন্ত মেঘ ডাকিল। বাদল রাতের মেঘের সেই গুরু গুরু গর্জন যেন দুইজনকে আরও নিকটে আহ্বান করিল। ফণীন্দ্র উঠিয়া উষাকে আপনার পাশে দাঁড় করাইল। বাঁ হাত দিয়া তাহাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া বলিল—“চল বাইরে একটু দেখে আসি।”

উষার আয়ত চোখ দু'টা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠিল। আলিঙ্গন বদ্ধ হয়ে দুইজনে অতি তৃপ্ত হৃদয়ে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুধু জলের ধারার শব্দ। ঘরের ছাদের উপর গাছপালার উপর ঘাসের উপর, সুধু মাটির উপর অবিশ্রান্ত জলের ধারা পড়িতেছে, সম্মুখে মুক্ত প্রান্তরের দিকে চাহিলে যেন মনে হয় এই বৃষ্টিধারার মধ্যে আকাশ ধরণীর মিলন হইয়াছে। বিদ্যুতের প্রভায় গাছের পাতায়, ঘাসের মাথায় সেই মিলন-নন্দের শিহরণ যেন ক্ষণে ক্ষণে ফুলিয়া উঠিতেছে, আর বিশ্বের নরনারীকে মিলনাবলম্বী অধীর করিয়া তুলিতেছে। তাই বৃষ্টি এই বর্ষা-রজনীতে প্রিয়ের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়াও নরনারীর প্রাণ বিরহে ব্যাকুল হইয়া উঠে!

বর্ষণের দিকে নিঃস্ব দৃষ্টিতে চাহিয়া দুইজনে পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল।

সুরেশবাবু সকালে ডাকের চিঠিপত্র সমস্ত পড়িয়া বাড়ীর ভিতর আসিয়া বলিলেন—“আজ একটা সুখবর আছে।”

সুশীলাসুন্দরী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি ?”

একটা ভালো জায়গায় বদলি হয়েছি।

বদলি ? কোথায় ?

রাণাঘাটে।

তা বেশ হয়েছে। তুমি বলতে না যে রাণাঘাটের মতো জায়গায় চাকরি করে' সুখ আছে ?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। জায়গা তত বড় নয়, কিন্তু সব সুবিধা আছে। S. D. O. দেয় বরাত ভাল হলে ও জায়গাটা পায়। আমার পক্ষে সব চেয়ে ভাল এইজন্য যে ফণী ইচ্ছামত সহজে কলকাতা থেকে যেতে আসতে পারবে।

ক্রমশঃ কথাটা সকলের কানে উঠিল। উষা ফণীন্দ্রকে বলিল—“এবার বেশ হবে ; শনিবারে শনিবারে তো আসতে হবেই। তা ছাড়া মাঝে ছুটি পেলেও না এলে ছাড়ছিনে !”

ফণী হাসিয়া বলিল—“কাঙাল ভাত খাবি না,—হাত ধোব কোথায় ? এ সব কি আর তোমাকে বলে দিতে হবে ? কলকাতা থেকে রাত্র এক ঘণ্টার পথ। দরকার হলে সন্ধ্যায় এসে সকালে ফেরা যাবে।”

উষা মনে মনে প্রীত হইয়া বলিল—“কত আস দেখা যাবে !”

তাহার পরদিনই সুরেশবাবুর বিদায়োপলক্ষে সভা হইল। সুরেশবাবু

ঠাঁহার সদয় ব্যবহার, নিরহঙ্কার কথাবার্তা, দেশের অসুবিধা দূর করিবার জন্ত আন্তরিক চেষ্টা ইত্যাদি সদগুণের জন্ত সকলেরই প্রিয় ছিলেন। শান্তিবিধান বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সাবধান ও ধর্মভীরু ছিলেন। বেশী শান্তি দিয়া তিনি নাম কিনিতে বা উন্নতির পথ সুগম করিতে কোন দিন চাহেন নাই। কর্তব্যপালনই ঠাঁহার লক্ষ্য ছিল। কর্তৃপক্ষের সন্তোষ বিধানের জন্ত কখন আপনার বিবেকের বিরুদ্ধে তিনি কার্য্য করিতেন না।

মেহেরপুরে জনকয়েক সাহিত্যিক ছিলেন। ঠাঁহাদের চেষ্টায় বিদায়োপলক্ষে একটি গান ও একটি কবিতা রচিত হইয়াছিল। গানটির ভাষা এমনই সুন্দর করুণ হইয়াছিল এবং যে গাইয়াছিল সে বার বৎসরের বালকের কণ্ঠস্বর এতই মধুর ছিল যে, গানের সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই মনে হইল যে, একজন অতি নিকট আত্মীয়, একজন সত্যকার হিতৈষী আজ ঠাঁহাদের ছাড়িয়া যাইবেন। কাহারও কাহারও চোখে জল পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। সুরেশবাবু বড় কোমল প্রকৃতির লোক। গান শুনিয়া ঠাঁহারও চক্ষু সজল হইয়াছিল।

জানি এ চোখের জল একটা সাময়িক উত্তেজনার ফল মাত্র, জানি আর মাস কয়েক পরে এ সমস্ত হয়ত গল্পকথায় পর্য্যাবসিত হইবে—তবু মনে হয় ইহারও প্রয়োজন আছে। এই আমাদের খণ্ডজীবনগুলি যদি নিরর্থক হয়, ইহার জন্ত কাহার মনে যদি কোথাও একটা দাগ পর্য্যন্ত না পড়ে, তাহা হইলে এই সব খণ্ডজীবনের সমষ্টি আমাদের পরিপূর্ণ জীবন ফেলিয়া যাইবার সময়েও তো কাহারও চোখে জল দেখিতে পাইব না, কাহারও ক্রান্ত সেদিন কোন ব্যথা বাজিবে না। আর অপরের সেই অশ্রুবিন্দুর অভাবে সেই ক্ষণেকের বেদনা বোধ না জানিলে সমস্ত জীবনই যে ব্যর্থ বলিয়া মনে হইবে।

একজন একটি কবিতা পড়িলেন। কবিতাটি ঠাঁহার চরিত্র-মাধুর্য্য

লইয়া রচিত—একটি গাথার মতো। ‘মমতা’ প্রাণ দিয়া সব জীবের বিচার, কারাগারে তাহার মৃত্যু,—স্ত্রীর আত্মহত্যা, নিরাশ্রয় কন্যাকে আশ্রয় দান ও কন্যাবৎ পালন—এই সমস্ত শত মিষ্ট ভাষায় তাহাতে বর্ণিত হইয়াছিল।

তারপর প্রথামত এক এক করিয়া অনেকে বক্তৃতা করিলেন। গানের যে করুণ প্রভাবটুকু হইয়াছিল বক্তৃতার দ্বারা তাহার অনেকখানি হ্রাস হইয়া গেল। তারপর সুরেশবাবু উঠিয়া এই সমস্ত আয়োজন ও সম্মান দানের জন্ত সমবেত সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তিনি যাহা করিয়াছেন সবই তাঁদের কর্তব্য ; একটুও বেশী তিনি করেন নাই ; আরও বেশী করা তাঁহার উচিত ছিল, হয়ত করিবার ইচ্ছাও ছিল, কিন্তু সে ইচ্ছা সফল হয় নাই। এই সমস্ত অবশ্য বক্তব্য কথাগুলি ধীরে ধীরে এমনভাবে বলিলেন যে, সকলেরই মনে হইল, কথাগুলি তিনি হৃদয় দিয়া বলিতেছেন। তারপর গানের সঙ্গে সভার কার্য শেষ হইল। সকলে জলযোগ করিয়া আপনার গৃহে ফিরিলেন।

একদিন নূতন S. D. O. আসিয়া কার্যভার গ্রহণ করিলেন। স্থির হইল সকলে একসঙ্গে মেহেরপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিবেন এবং সেখানে সপ্তাহ খানেক থাকিয়া রাণাঘাটে আসিয়া কার্যভার গ্রহণ করিবেন।

অনেক দুস্থ পরিবারকে সুশীলাসুন্দরী গোপনে সাহায্য করিতেন, যাইবার দিন সেই সব অনাথা ছাত্র—স্বামী-পুলহীন বিধবা সজল চক্ষে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের সকলকে সুশীলাসুন্দরী মিষ্ট কথায় শাস্ত করিলেন।

তারপর তাদের অশ্রুজলের উপর দিয়া তিন বৎসরের বাসস্থান ত্যাগ করিয়া সকলে যাত্রা করিলেন।

চুণি নদীর জল খুব বাড়িয়াছে ।

ফেরীঘাটে নদীর দুই পারে পাকা রাস্তার অনেক দূর পর্য্যন্ত জল গিয়াছে । রাণাঘাট স্কুলের পশ্চিম দিকের প্রাচীরের হাত দুই নীচে জল পৌঁছিয়াছে । বেলা দু'টা বাজিয়া গিয়াছে । স্কুলের কাছেই নদীর ধারে বটগাছের আড়ালে দুইটি ছেলে ক্লাশ হইতে পলাইয়া ঘণ্টা অবসানের অপেক্ষা করিতেছে ।

শান্তিপুরের দিক হইতে ঘোড়ার গাড়ী করিয়া আসিয়া নূতন S. D. O. থেয়ার নৌকায় পার হইয়া স্কুলের ঘাটে নামিলেন । যে ছেলে দু'টা ক্লাশ পলাইয়া নদীর ধারে বসিয়াছিল, তিনি তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—
“তোমরা কোন ক্লাশে পড় ?”

একজন উত্তর করিল—“Fifth class.”

আর তুমি ?

অপর ছাত্রটি বলিল—“Third class.”

তোমরা এখন পড়া ছেড়ে এখানে কেন ?

ছেলে দু'টি কোন উত্তর করিল না ।

এ ঘণ্টার পড়া করনি বুঝি ?

থার্ড ক্লাশের ছেলেটি বলিল—“কেন করব না আমরা । আমাদের এখন ছুটি ।”

“এখন কিসের ছুটি বাপু ? সকলের এখন ক্লাশ হচ্ছে, আর তোমাদের দু'জনের ছুটি ! চলত আমার সঙ্গে তোমাদের হেডমাষ্টার মহাশয়ের কাছে !

ছেলে দু'টি ইতস্ততঃ করিতে লাগিল ।

থার্ড ক্লাশের ছেলোট বালিল—“হেড মাষ্টারের কাছে যেতে যাব কেন ? আমরা নিজেদের ক্লাশে যাব । চল্ তো রে ।”

ছেলে দু’টি উঠিয়া স্কুলের ভিতর প্রবেশ করিল । পশ্চাৎ পশ্চাৎ S. D. O. আসিলেন ।

হেড মাষ্টার মহাশয় তখন অফিসেই ছিলেন । তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনার পরিচয় দিয়া বালিলেন—“আমি এক সময়ে এই স্কুলের ছাত্র ছিলাম । এই স্কুল থেকে এনট্রান্স পাশ করি ।”

তাই নাকি ? আপনি কি সূত্রে এখানে ছিলেন ?

বাবা এখানের মুন্সেফ ছিলেন ।

ওঃ ! তখন হেড মাষ্টার ছিলেন কে ?

ভোলানাথবাবু ।

ভোলানাথবাবুর পরেই আমি এসেছি ।

সেই থেকে আপনি এখানে আছেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ । আমার ৩৩ বৎসর হ’ল এখানে ।

তা হলে তো অনেকদিন আছেন ! এখন তো পেন্সন্ পাওয়ার কথা !

হ্যাঁ । পেন্সনের কথা আর বলবেন না । এখন যে ক’টা দিন বাঁচি—অন্ততঃ যতদিন চাকরী করতে পারি—সে ক’দিন চাকরী করতে দিলে বাঁচি !

তার মানে ?

দুঃখের কথা বলব কি, এখন কর্তৃপক্ষের কর্তব্য জ্ঞান হয়েছে !

Wohey বলেছিলেন না If I had served God’s I have served king he could not have left me in my old age ? Private স্কুলের দশাই এই !

এ বড় দুঃখের কথা । আপনার খুব শুভাম শুনেছি । তার ওপর

এতদিনকার কাজ আপনার। একটা কৃতজ্ঞতা তো আছে! হ্যাঁ, ভাল কথা—হিরু বলে স্কুলের যে চাকর ছিল, সে আছে?

আজ্ঞে না সে মারা গেছে—তিন বৎসর হল। আজকাল তার ভাগনেই কাজ করছে। হিরু অনেক কাল স্কুলে কাটিয়ে গেছে।

হ্যাঁ, স্কুলটাকে সে একেবারে নিজের জিনিস বলে মনে করত। তার একটা গরু ছিল সেও বোধ হয় ভাবত, স্কুলে তার একটা স্বত্ব আছে। গরুটা কাগজ পর্য্যন্ত খেত। জানালার কাছে দাঁড়ালে দুই একখানা কাগজ না খেয়ে নড়ত না!

তারপর দুই জনে স্কুলের আয় ব্যয় অগাণ্ড অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হইল।

S. D. O বলিলেন—“একবার যদি অনুমতি করেন স্কুলটা তবে ভাল করে দেখে নিই।”

হেডমাষ্টার উঠিয়া বলিলেন—“বেশ ত দেখুন না!”

হেডমাষ্টার S. D. O কে সঙ্গে লইয়া স্কুলের চারিধার ঘুরিয়া আসিলেন

S. D. O বলিলেন—“এখন আর সে স্কুল বলে চেনা যায় না। অনেক বদলে গেছে!”

আজ্ঞে হ্যাঁ, সে আজ কত কালকার কথা!

দু’জনে আবার অফিসে আসিয়া বসিলেন।

S. D. O বলিলেন—“আমার একটা ছেলেকে আপনার কাছে দিয়েছি। তার দিকে একটু দয়া করে লক্ষ্য রাখবেন।”

মণীন্দ্রের কথা বলছিলেন! নিশ্চয়ই রাখব। চমৎকার ছেলেটি! যেমন বুদ্ধিমান আর তেমনি বিনয়ী ও পরোপকারী। একটু খাটলেই compete করতে পারবে।

আপনাদের আশীর্বাদ !

আর একটু পরে S. D. O উঠিলেন। হেডমাষ্টার রাস্তা পর্যন্ত আগাইয়া দিলেন।

“একদিন পায়ের ধুলো দেবেন বাসায়” S. D. O সবিনয়ে বলিলেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাব।

S. D. O চলিয়া গেলেন। হেড মাষ্টার ভাবিতে ভাবিতে ফিরিলেন S. D. O র স্বভাব বড় মধুর। একরূপ S. D. O আজকাল বিরল।

বলা বাহুল্য ইনি মেহেরপুরের সুরেশবাবু—রাণাঘাটে আসিয়া কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

৩২

দেড় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মণীন্দ্র এবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবে। আজ কলিকাতা যাত্রা করিবে। দুই দিন পরে পরীক্ষা আরম্ভ।

সকাল ৭টা বাজে। বাসার সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। চট্টার কিছু পূর্বে কলিকাতা যাইবার একটা ট্রেন ছাড়িবে। মণীন্দ্র সেই গাড়ীতে যাইবে। শনিবারে মণীন্দ্র বাড়ী আসিয়াছিল। আজ সোমবার ; দুই ভাই একসঙ্গে যাইতেছে।

কেহ কোথায়ও যাইবার সময় সুশীলাসুন্দরী তাহাকে না খাওয়াইয়া বাড়ীর বাহির হইতে দেন না ইহাই তাঁহার চিরকালকার অভ্যাস। তাঁহার বিশ্বাস অনাহারে যাওয়া কল্যাণ।

চাকর বামন উঠিবার আগে শাশুড়ি ও বধু শেষ রাত্রে উঠিয়া সব কাজ শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন। মায়ের সম্মুখে বসিয়া দুই ভাই খাইয়া লইল।

জিনিসপত্র যাহা লইয়া যাওয়া হইবে, সব পূর্কেই গাড়ীতে তোলা হইয়াছিল মণীন্দ্র প্রস্তুত হইয়া পিতা মাতা ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়াকে একে একে প্রণাম করিল। ইন্দু ও শান্তির সহিত কথা কহিয়া ভ্রাতৃপুত্র সরোজকে আদর করিয়া গাড়ীতে উঠিল।

সুশীলাসুন্দরী প্রণতঃ পুত্রের চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন করিবার সময়ে বিমল আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন আর ভাবিয়াছিলেন এমন সুন্দর সুশীল পুত্র, সকলেই প্রশংসা করে, বিদ্যা ব্যবহার ব্যায়ামাদি ক্রীড়া সব বিষয়ে সকলের অগ্রগণ্য—এমন সন্তানের মুখ পানে চাহিয়া কোন্ মায়ের হৃদয় না আনন্দ ও গর্বে পরিপূর্ণ হয় ?

মণীন্দ্রের চিত্তও নানা ভাবে নানা সুরে পূর্ণ হইয়াছিল বিশ্ববিদ্যার সিংহদ্বারে সে আজ অগ্রসর হইতেছে। সেখানে প্রবেশের অনুমতি পাইলে সেই প্রাসাদের অভ্যন্তরে কত কীর্তি, কত সৌন্দর্য্য, কত শিল্প প্রত্যক্ষ করিবে। দেশবিদেশের কত জ্ঞান আহরণ করিবে, কাব্য সাহিত্যের মণি মুকুতা উন্মুক্ত করিয়া রত্নরাজি গ্রহণ করিবে। আর এ বাত্মা যেন তাহারি সূচনা। আনন্দ ও দোষহীন গর্বে তাহার অন্তর পুলকিত হইয়া উঠিল।

গাড়ী চলিয়া গেল। সুশীলাসুন্দরী সব কাজ ফেলিয়া পুত্রের মঙ্গল ও অভীষ্ট সিদ্ধির জন্ত একমনে দেবতার নাম জপ করিতে লাগিলেন।

মণীন্দ্র সিদ্ধি লাভ করিয়া নিরাপদে ফিরিয়া আসুক। বিজয়ের আনন্দ তাহার সুন্দর মুখে নূতন সৌন্দর্য্য আনিয়া দিক্, সে দেশের ও দেশের সেবা করিয়া দেশের গৌরবস্থল হোক, সুশীলাসুন্দরী একান্তমনে সেই কামনাই করিতে লাগিলেন।

মায়ের এই নীরব নিয়ত প্রার্থনা সৃষ্টানের চিরদিনকার রক্ষাকবচ ও শত সুখ সৌভাগ্যের মূল

সশব্দে সেনেট হাউসের ঘণ্টা বাজিল। বুকি তার চেয়েও জোরে পরীক্ষার্থীদের বকের মধ্যে শব্দ হইতে লাগিল। ঢং! ঢং! ঢং! ঢং! সে শব্দে যেন বিন্দুমাত্র স্নেহ কি মমতা নাই—আছে শুধু কন্ঠের আহ্বান। শব্দ যেন ডাকিয়া বলিল—ছুটিয়া আয়, নয়ত এখনি দুয়ার বন্ধ করিয়া দিব।

পুত্র পিতার সহিত কথা কহিতেছিল, সে চমকিয়া কথা বন্ধ করিল। সহপাঠী সহপাঠীর সহিত পাঠের আলোচনা করিতেছিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে সে আলোচনা ত্যাগ করিল। অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ছাত্র কোন বইয়ের পাতা উল্টাইতেছিল, ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ মাত্র সে তৎক্ষণাৎ বই বন্ধ করিয়া সেনেটের সম্মুখে সেই প্রস্তর মূর্ত্তির পদতলে বই ছুড়িয়া ফেলিল। তারপর সকলে পশ্চাতের দিকে না চাহিয়া ব্যগ্রহৃদয়ে দ্রুতপদে পরীক্ষা মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মণীন্দ্রও ইহাদের সঙ্গে পরীক্ষা দিতে আসিয়াছে।

আজ ১লা মার্চ। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার প্রথম দিন। সম্মুখে এক একটি উঁচু ডেস্ক লইয়া টুলের উপর এক একটি ছাত্র বসিয়া গিয়াছে। সম্মুখে পাশে পিছনে মনীষিগণের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তৈল চিত্র, কোথাও বা প্রস্তর মূর্ত্তি সেনেট হলের প্রভাব ও সম্মান বৃদ্ধি করিতেছে। যাহারা আজ এইখানে বসিয়া পরীক্ষা দিতেছে তাহাদের পূর্বে ওইখানে বসিয়া কত ছাত্র পরীক্ষা দিয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে কতজনের স্বর্ক গরিমায় বঙ্গদেশকে জগতের কাছে প্রসিদ্ধ করিয়া দিয়াছে। তাহাদের পরেও কতজন এই খানে বসিবে যাহারা এখনও হয়ত মায়ের কোলে ধরণীর বুকে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে।

প্রশ্ন পত্র দেওয়া আরম্ভ হইল। সকলে আবেগপূর্ণ হৃদয়ে প্রশ্ন পত্র গ্রহণ করিল। কেহ কেহ তাহারি মধ্যে চক্ষু মুদ্রিয়া একবার ভগবানকে স্মরণ করিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিল, যেন প্রশ্নগুলি সব তাহাদের জানা হয়।

আজ ইংরাজীর পরীক্ষা। প্রথম খণ্ডে ইংরাজী অনুবাদ ও ইংরাজী রচনার প্রশ্ন। অখণ্ড মনোযোগের সহিত সকলে প্রশ্ন পত্র পড়িতে লাগিল। পড়া শেষ হইলে কত চক্ষু উৎসাহের দীপ জ্বলিয়া উঠিল। কত চক্ষু তাহা নিভিয়া গেল। সকলে লিখিতে আরম্ভ করিল। সুধু কাগজের উপর লেখনী চালনার শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। গার্ডরা আপন আপন সারির মধ্যে হলের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পাদচারণা করিতে লাগিল।

তিন ঘণ্টার পর প্রথমার্ধ পরীক্ষা শেষ হইল। সশব্দে ঘণ্টা বাজিল। সম্মুখে ডেস্কের উপর উত্তরের খাতা রাখিয়া দিয়া ছাত্রেরা একে একে বাহির হইয়া গেল। তাহারা বাহিরে আসিবামাত্র নানা কলরবে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল।

হাঁারে উদার-হৃদয়! কি লিখেছিস্?

High souled.

আমি লিখেছি Noble hearted ; ভুল হবে নাত ?

ভুল কেন হতে যাবে! তুই কি লিখেছিস্ রে গোবিন্দ ?

Liberal hearted.

First boy কি না তাই তোর একটু আলাদা লিখতে হয়।

Essay কোনটা লিখেছিস্ ভাই ?

Politeness.

আমি Choice of Profession লিখেছি। প্রথমটা কিন্তু সহজ ছিল।

আরে, সহজ আর শক্ত। সাম্রাণের Essay বই থেকে সমস্ত ছাঁকা বসিয়ে দিয়েছি। একটা অক্ষর আর কাটতে হচ্ছে না; একেবারে P. R. S. এর লেখা।

তবেই মরেছিস তুই। দেখিস নি, Candidates are required to answer in their own words as far as practicable—লেখা আছে! এই বুঝি তোর own words হ'ল?

কি হে মণীন্দ্র তুমি কি করেছ?

আমি নিজের ইংরাজীতে যা পারি লিখেছি।

আমি বাবা চালাক ছেলে আছি। হেড মাষ্টারের লেখা Essay একেবারে উগ্গরে দিয়ে এসেছি। কান ধরব আর ১৫ নম্বরের মধ্যে ১২ নম্বর আদায় করব।

কিন্তু শালা কি lengthy paper করেছে? Translation দিয়েছে একবার এক গঙ্গা!

ছিঃ গালাগালি দিতে আছে! এই বুঝি বিত্তে হচ্ছে?

এই রকম নানা কলরব করিতে করিতে ছেলেরা গোলদীঘির চারি ধার পূর্ণ করিয়া ফেলিল।

মণীন্দ্র গোলদীঘির সম্মুখেই দাদাকে দেখিতে পাইল। সে প্রকুল মুখে বলিল, “বেশ কোশেচন পড়েছিল দাদা। ভাল হয়েছে।”

ফণীন্দ্র আনন্দ প্রকাশ করিয়া মণীন্দ্রকে লইয়া গোলদীঘিতে আসিল। সেখানে তখন প্রায় মেলা বসিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে খাবারওয়ালারা দোকান পাতিয়া বসিয়াছে, সববৎ বিক্রেতা, নানাবিধ ভাজার-পসরা—কিছুরই অভাব নাই। পরীক্ষার্থীরা কেহ ঘাসের উপর বসিয়াছে। কেহ সেখানে পূর্ব হইতে রচিত শয্যাতে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে, কেহ বা দীঘির চারিদিকে ঘুরিতেছে।

একটা পরীক্ষার্থী বোধ হয় জমীদারের পুত্র হইবে—ঘাসের উপর বেশ পুরু বিছানা করিয়া আধশোয়া অবস্থায় আরাম করিতেছে। তাহার সম্মুখে একখানা ইংরাজী Grammar খোলা আছে। একটি প্রোট লোক—বোধহয় খানসামা—দিব্য করিয়া কলিকায় তামাক সাজাইয়া গড়গড়ার উপর বসাইয়া নলটি তাহার হাতে দিল। যুবক তিন ঘণ্টা পরে তামাকু পাইয়া পরম আনন্দে টানিতে লাগিল।

ছাত্রটির বয়স দেখিলে ২৫এর বেশী বলিয়াই মনে হয়। মণীন্দ্র ম্যাট্রিকুলেশনের এত বড় ছাত্র কখন দেখে নাই। দাদাকে সে চুপি চুপি বলিল—“এতবড় ছেলে ফাষ্ট ক্লাশে পড়ত!”

ফণীন্দ্র হাসিয়া বলিল—“তাতে আর ক্ষতি কি! তবে বাবুটির তামাক খাবার বাহাদুরি আছে। সামনে একবারে ধূমলোক সৃষ্টি করে ফেলেছেন।”

ফণীন্দ্রের পাচক বাসা হইতে জলখাবার তৈয়ারি করিয়া আনিয়াছিল। ফণীন্দ্র মণিকে জলখাবার খাওয়াইল। জলযোগ করিয়া মণি ঘণ্টার অপেক্ষা করিতে লাগিল। ঘণ্টা বাজিতেই মণি সেনেটে প্রবেশ করিল; ফণী ফিরিয়া গেল।

এবার অপঠিত পুস্তক হইতে উদ্ধৃত গণ্ড ও পদের সারমর্ম লেখা ও ব্যাকরণের প্রশ্নের উত্তর করিবার পালা।

৫টা বাজিতে পরীক্ষা শেষ হইল। মণীন্দ্র খুব ভাল উত্তর লিখিতে পারিয়াছিল। মনের আনন্দে সে বাসায় ফিরিল।

গল্প করিতে করিতে দুই ভ্রাতায় জলযোগ করিল। তারপর উভয়ে খানিকটা বেড়াইয়া সন্ধ্যার পরই বাসায় ফিরিল। ফণীন্দ্র ইচ্ছা করিয়াই মণীন্দ্রকে গান শুনাইল। গানের সুর তাহার মস্তিষ্কে বেশ পরিষ্কৃত করিয়া দিল। গান শুনিয়া মণীন্দ্র অন্ধ ও জ্যান্মিতির বই লইয়া বসিল। ১০টা বাজিতে মণীন্দ্র দাদার কোলে শয়ন করিল।

ফুলের দল ধীরে ধীরে মুদিত হইয়া গেলে যেমন দেখায়, মণীন্দ্রের দেহটি তেমন মুদিয়া থাকিল। নিদ্রার মধ্যেও সেই পরীক্ষামন্দির, সেই প্রশ্নপত্র, গার্ডদের সেই নিঃশব্দ দ্রুত পদসঞ্চারণ, গোলদীঘির শান্ত ছবি একে একে সব যেন ছবির মতো ফুটিয়া উঠিল।

ক্রমে রাত্রি অবসান হইল; প্রভাতের আলো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সেই প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকে মণীন্দ্র নৃতন উৎসাহ লইয়া জাগিল।

১৫

দ্বিতীয় দিন গণিতের পরীক্ষার পর ছেলেরা বাহিরে আসিল। মণীন্দ্র যথাসময়ে আসিয়া ভ্রাতার জন্ম অপেক্ষা করিতে লাগিল, মণীন্দ্র আসিলে তাহাকে সঙ্গে করিয়া গোলদীঘির ভিতর একটি গাছের তলায় আসিয়া বসিল, দাদার সহিত কথা কহিতে কহিতে জলযোগ করিতে লাগিল।

হাত মুখ ধুইয়া ও মুছিয়া মণীন্দ্র বলিল, “দাদা কাল থেকে তুমি আর এ সময় এসো না। কালীচরণ খাবার নিয়ে এলেই চলবে।”

তোমার কোন অসুবিধে হবে না!

না!

বাসা চিনে যেতে পারবে তো?

খুব পারবো।

আচ্ছা বেশ তাই করা যাবে। বরং পাঁচটার সময় আমি এখানে এসে থাকুব, দু'জনে একসঙ্গে বাসায় ফিরিব।

কি দরকার তাতে? তুমি বরাবর বাসাতেই যেও। আমি একাই ফিরিব।

ফণীন্দ্রের সেদিন আর দেৱী করিবার উপায় ছিল না ; তখনি চলিয়া গেল । পরীক্ষা পুনরায় আরম্ভ হইতে কএক মিনিট দেৱী ছিল । ফণীন্দ্র এধার-ওধার বেড়াইতে লাগিল ।

সেই জমীদার পুত্র ২৫ বৎসর বয়সের ছাত্রটি তেমনি করিয়া গড়গড়াতে তামাক খাইতেছিল । তাহার তখনও জলযোগ আরম্ভ হয় নাই ! দুইজন লোক আহাৰ্য্য যোগাড় করিতেছিল । একটি ভৃত্য, অপরটি বোধ হয় পাচক । ভৃত্যটি বড় একখানা ছুরি দিয়া অসময়ের আম ছাড়াইয়া একখানি রুপার থালায় রাখিল । কিস্মিস্ পেশ্তা বাদাম দুই তিন মুঠা করিয়া সেই থালার বিভিন্ন স্থানে সাজাইল । গুটি দশেক চাটিম কলা তাহাদের আবরণ হইতে সচ্য মুক্তিলাভ করিয়া সেই থালার শোভা বৃদ্ধি করিল । থালায় যেটুকু স্থান অবশিষ্ট ছিল ৫টি বড় বড় সন্দেশ ও ৫টি রসোগোল্লা তাহা অধিকার করিয়া লইল ।

থালাখানি তখন সযত্নে ও সমাদরে বাবুটির সম্মুখে রাখা হইল । ইহার পাশে পাচক অপর একখানা খাণ্ডপূর্ণ থালা স্থাপিত করিল । এই দ্বিতীয় থালাখানিতে ছিল পাচকের হাতের তৈয়ারী ১৫ খানি লুচি ও ২।১ রকমের তরকারী । ছাত্ররূপী বাবুটি গড়গড়ার নল ফেলিয়া খাণ্ডদ্রব্যে মনোনিবেশ করিল ।

ক্ষিপ্রগতিতে অর্ধেক সমাধা করিবার পর একটু অবসর পাইয়া বাবুটি চাহিয়া দেখিল খানিকটা দূরে এক অতি শীর্ণ ভিখারী দাঁড়াইয়া নির্ণিমেষ নয়নে তাহার আটারের ক্ষিপ্রগতি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিতেছে । আহাৰ্য্যের এতটী বৃহৎগ্রাস মুখে পুরিয়া কিঞ্চিৎ অস্পষ্টস্বরে বাবুটী বলিল — “কিরে, কি দেখছিস্ এখানে হাঁ করে ?”

শীর্ণ লোকটি একবার মুখনাড়িবার চেষ্টা করিয়া হাত পাতিল । পাশেই — একগাছি বাঁধান ছড়ি পড়িয়া ছিল, বাবুটি ভিখারীকে একটা গালি

দিয়া সেই ছড়ি তুলিয়া লইবামাত্র পরবর্তী ব্যাপারটির আশ্বাদ অনুমান করিয়াই ভিখারী পলায়ন তৎপর হইল। তাহার শীর্ণ দেহটাকে আঘাত হইতে বাঁচাইবার চেষ্টাটা এতই ক্ষিপ্রবেগে হইয়াছিল যে পড়িতে পড়িতে কোন রকমে সে বাঁচিয়া গেল। একটু দূরে যাইতেই ছড়ি গাছটি মাটিতে আঘাত করার শব্দ তাহার কানে আসিল।

বয়স্ক ছাত্রটির আহাৰ মণীন্দ্রকে মুগ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া অপরের খাওয়া—তাহা যতই মনোরম হউক না কেন—দেখা মোটেই ভাল দেখায় না। তাই কাছাকাছি এখার ওখার পাই-চারি করিতে করিতে সবখানি দেখিয়া লইতেছিল। ভিখারীর জন্ম তাহার সত্যই দুঃখ হইতেছিল; কিন্তু তাহার কাছে তখন একটি পয়সাও ছিল না যাহা ভিখারীর হাতে দিয়া তাহার অন্ততঃ কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারে। তাহার এতদিনকার অভ্যাস পয়সা কাছে না রাখা, মণীন্দ্র আজ অত্যন্ত অক্লান্ত বলিয়া মনে করিল। নিতান্ত দুঃখের সহিত মণীন্দ্র সেস্থান হইতে সরিয়া গেল।

গোলদীঘির একেবারে পশ্চিম পাড়ে আসিয়া মণীন্দ্র আর একটি দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিল। সেই শীর্ণ ভিখারীর ক্ষুধিত দৃষ্টি মনে করিয়া যখন সে আবার সেই দিকে অগ্রসর হইবে ভাবিতেছিল, কে একজন পেছন হইতে বলিল, “আবার কেন মা! এত খানি বয়ে এ সব নিয়ে এলে!”

মণীন্দ্র সেই দিকে ফিরিয়া দেখিল অদূরে ঘাসের উপর মায়ের কাছে একটি ছেলে দাঁড়াইয়া। ছেলেটি মায়ের হাত হইতে ব্যস্ত হইয়া একটা রেকাবি ও একটি বাটি লইয়া সেই ঘাসের উপর রাখিল। অন্তরীক্ষণে মণীন্দ্র বুঝিল এ ছেলেটিও পরীক্ষার্থী। বোধ হয় দরিদ্র এবং সংসারে আর কেহ নাই তাই মা আপনি খাবার লইয়া আসিয়াছেন। মণীন্দ্রের কৌতূহল হইল, দেখে সে পাত্রে কি আছে। কিন্তু তাড়াতাড়ি আবার সেই দিকে ফিরিয়া

আসা অশোভন হইবে মনে করিয়া মণীন্দ্র কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া আবার সেই দিকে ফিরিল। ঠিক সেই স্থানটী অতিক্রম করিবার সময় মণীন্দ্র লক্ষ্য করিয়া দেখিল, পিতলের রেকাবিতে খান পাঁচ ছয় রুটী ও একটা তরকারী রহিয়াছে ; আর পাথরের বাটীতে আধ বাটী দুধ।

তাহাদের অতিক্রম করিয়া স্বল্প দূরে আসিতে মণীন্দ্র শুনিল, ছেলেটা বলিতেছে, “আবার দুধ কেন আনলে মা ? অসুখ থেকে উঠে তুমি একটু দুধ খেলে না আর—”

মা বাধা দিয়া বলিলেন—“তা হোক বাবা ! একজামিনের পড়া, তার উপর এত খাটুনি। পোয়াটেক দুধও যদি না খাবি তো কি খাবি বাবা।”

মণীন্দ্রের ইচ্ছা হইল সেই খানটিতে দাঁড়াইতে কিংবা বরং আরও খানিকটা পিছাইয়া মা ও ছেলের সমস্ত কথাবার্তার প্রতি অক্ষরটি পর্যন্ত মন দিয়া শুনে। কিন্তু আবার এখনি ফিরিলে তাঁহারা কি ভাবিবেন ভাবিয়া সে আরও দূরে চলিয়া আসিল।

আরও খানিক আসিয়া মণীন্দ্র একবার পিছনের দিকে চাহিল। দেখিল সেই শার্ণ ভিখারী প্রসাদ ভিখারী বুভুক্ষু কুকুরের মতো সেই আহারেরত ছেলেটির দিকে যাইতেছে। কি হয় দেখিবার জন্য মণীন্দ্র আবার সেই দিকে ফিরিল।

ভিখারী হাত ঘোড় করিয়া কি একটা কথা বলিয়াছে এমন সময় মণীন্দ্র সেখানে পৌঁছিল। যেন ভিখারীকে দেখিবার জন্যই সে ঐ খানে দাঁড়াইয়াছে এই ভাব দেখাইয়া মণীন্দ্র স্থির হইয়া সেখানে দাঁড়াইল ও সমস্ত লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল।

ছেলেটি দুধটুকু পান করিয়া একখানি রুটি ততক্ষণে উদরস্থ করিয়াছে। ভিখারী কাঁহল, “দু’দিন খাইনি বাবু। কিছু খেতে দিয়ে প্রাণ বাঁচান।” বলিয়া ভিখারী সেখানে অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িল।

ছেলেটি স্তম্ভিত হইয়া ভিখারীর পানে একবার ভাল করিয়া চাহিল। পর মুহূর্তে সেই রেকাবির অবশিষ্ট রুটি ও তরকারি ভিখারীর প্রসারিত হাতের উপর ভুলিয়া দিল।

ভিখারীর চোখে ও মুখে একটা বিস্ময় আনন্দ ফুটিয়া উঠিল। কৃতজ্ঞ কুকুরের লাঙ্গুল সঞ্চালনের ন্যায় ভিখারী বার কয়েক ঘাড় নাড়িয়া একখানা রুটি একেবারে মুখের মধ্যে ঠেলিয়া দিল। বোধ হয় আধ মিনিটের মধ্যে তাহা উদরে পৌঁছিল। আর একখানি রুটিও ঐখানে গেল। ভিখারী তাকাইয়া দেখিল আর দুইখানি রুটি তখনও আছে। খাওয়া বন্ধ করিয়া সে তখন আপনার মলিন বস্ত্রাঞ্চলে রুটি দুইখানি বাঁধিয়া বলিল—“বুড়ীমা আছে, নড়তে পারে না ; তার জন্ম একখানা থাক। বুড়ীরও অদৃষ্টের দুঃখু তাই মরে না।” তারপর দীঘির পাড়ে আসিয়া দুই হাত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া জল আকর্ষণ পান করিয়া বাকী ক্ষুধাটুকু মিটাইল।

ছেলেটি যেন একটু অপরাধীর মতো মায়ের পানে চাহিয়া বলিল—“মা তুমি রাগ কল্পে—দিয়ে দিলাম বলে !”

অতি প্রসন্ন সুন্দর হাসি হাসিয়া মা বলিলেন—“না বাবা, তুমি ভালই করেছ।”

সেই কথা ও হাসির মধ্যে সর্ব দুঃখ স্নেহ ও মমতা যেন ইন্দ্রধনুর বিভিন্ন বর্ণের মতো পাশাপাশি ফুটিয়াছিল।

মণীন্দ্র মা ও ছেলেকে বেশ করিয়া চিনিয়া রাখিল।

পরদিন প্রথমার্দ্ধ পরীক্ষার পর মণীন্দ্র দেখিল, যে ভিখারীকে তাহার আহাৰ্য্য ধরিয়া দিয়াছিল, সে ছেলেটি সেই একই স্থানে বসিয়া আছে।

বাসা হইতে মণীন্দ্র খাবার আনিতে নিষেধ করিয়া আসিয়াছিল এবং পকেটে করিয়া একটি টাকা আনিয়াছিল। ছেলেটির সহিত পরিচয় করিতে মণীন্দ্র আজ কৃতসংকল্প হইয়াছিল। আজ আর তাই কাল বিলম্ব না করিয়া মণীন্দ্র একেবারে ছেলেটির কাছে আসিয়া ঘাটের উপর বসিয়া পড়িল। ছেলেটি একটু বিস্মিত হইয়া মণীন্দ্রের পানে চাহিল।

মণীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নাম কি ভাই ?

ছেলেটি মণীন্দ্রের দিকে ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল, শ্রীগৌরান্দ গঙ্গোপাধ্যায়।

মণীন্দ্র ভাল করিয়া ছেলেটির পানে চাহিয়া দেখিল—গৌরান্দ নামটি ছেলেটিকে মানায় বটে। অঙ্গের বর্ণ গৌর তো বটেই তেমন উজ্জ্বল গৌর অথচ স্নিগ্ধ বর্ণ নারীর মধ্যেও কদাচিৎ দেখা যায়। তাহার সেই চম্পুক বর্ণ স্থানে স্থানে ছিন্ন মোটা কিন্তু পরিষ্কৃত কালরংয়ের ছিটের কামিজের মধ্য দিয়া আকাশের বুক চিরিয়া বিদ্যুৎ প্রভার মতো দেখাইতেছিল। তাহার দীর্ঘ ও কৃশ দেহ, মাথায় ছোট করিয়া ছাঁটা রেশমের মতো সূক্ষ্ম ও মসৃণ ঘন চুল। প্রশস্ত উন্নত ললাট, প্রশান্ত উজ্জ্বল চক্ষু, সূক্ষ্ম ও কথা কহিবার সময়ে কাঁপিয়া ওঠা ওষ্ঠাধর সমস্ত মিলিয়া তাহার আকৃতিকে একটি বিশিষ্টতা দান করিয়াছিল।

মণীন্দ্র বলিল—কাল তোমার খাবার খাওয়া ও ভিখারীকে খাবার

দেওয়া দুইই আমি দেখেছি ; ইচ্ছা হচ্ছিল আমিও ওর থেকে একটু নিই । তোমাকে এখন আলাপে ‘তুমি’ বলাতে রাগ কচ্ছনা তো ?

প্রথম প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া একটু লজ্জিত ভাবে গৌরান্দ্র বলিল, যে, সে একটুও রাগ করে নাই ।

আজ তোমার এখনও খাওয়া হয়নি ?

না ।

আজও কি মা খাবার নিয়ে আসবেন ?

বোধ হয় আসবেন ।

তোমার খিদে লাগেনি ?

না আমার ইস্কুলে কিছু খাওয়া অভ্যাস ছিল না । একেবারে ছুটির পর বাসায় এসে খেতাম । মাকে ত’ বলেছিলাম । কিন্তু উনি তা শুনলেন না । মিছামিছি এই এতখানি পথ হাঁটা ।

কোথায় তোমাদের বাসা ?

সুকিয়া ষ্ট্রীটে ।

এখনও তো মা এলেন না । ততক্ষণ আমরা এক কাজ করি না কেন ?

কি কাজ ?

কিছু খাবার কিনে দু’জনে খাই । তারপর তোমার খাবার এলে আবার দু’জনে মিলে খাওয়া যাবে ।

উত্তরে গৌরান্দ্র কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় পূর্বদিকের রাস্তায় দৃষ্টি পড়িতেই বলিয়া উঠিল, “মা আসছেন ।”

সঙ্গে সঙ্গে গৌরান্দ্র উঠিয়া গেল এবং একটু পরেই মায়ের হাত হইতে খাবার আপনার হাতে লইয়া মায়ের আগে আগে সেই স্থানে আসিল ।

মণীন্দ্র উঠিয়া গৌরান্দ্রের মাকে প্রণাম করিল । তিনি মণীন্দ্রকে

আশীর্বাদ করিলেন। পরে সেখানে বসিয়া পুত্রের হাত হইতে খাচার পাত্র লইয়া মণীন্দ্রের পানে চাহিয়া বলিলেন—“তুমি যে কেন গোরের খাবার ভাগ করে খাবে বলেছিলে বাবা তা আমি বুঝেছি।”

মণীন্দ্র কিছু বলিবার আগেই আবার তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন—“এখন তো এর খাবার এসেছে বাবা। এখনও কি এই মোটা রুটি ভাগ করে খাবার ইচ্ছে আছে?”

মণীন্দ্র বলিল—“তাহলে মা আপনি আমার খেতে চাইবার কারণ বুঝতে পারেন নি। এখানে তো কত ছেলে কত বকমই খাচ্ছে—লাখ-পতি লোকের ছেলে থেকে গরীবদের ছেলে পর্য্যন্ত। কিন্তু এমন খাবার আর কারু ভাগ্যে জোটেনি। সেই লোভে এসেছিলাম। এসেছিলাম ঠিক হ'ল না এসেছি। এখন দিন আমাকে ভাগ।”

“বেশ খাও তো বাবা।” বলিয়া গৌরাজের মা খাবারের পাত্র সেখানে রাখিলেন। সেই খানপাঁচেক রুটি খানিকটা তরকারি এবং একটি বাটিতে পোয়াটেক দুধ।

কিন্তু দু'খানি পাত্রে যে ভাগ করিয়া দিবেন তাহারও উপায় নাই। গৌরাজের মাকে একটু ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া মণীন্দ্র বলিল, “মা, আমিও ব্রাহ্মণ। এক রেকাবিতে আমরা দু'জনেই খেতে পারি। নয় ত আমাকে ঐ গামছায় দিন আর গৌরাজের রুটি পাত্রেই থাক।”

প্রথমে একটু বিস্ময় পরে আনন্দ তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। তিনি গামছাখানি সেই ঘাসের উপর বিছাইয়া তাহার উপর খাবারের পাত্র রাখিয়া দিলেন। বলিলেন—“আমার ভুল হইয়াছিল বাবা, খাও।”

দু'জনে হাসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল।

গৌরাজের মা মণীন্দ্রের বাড়ী বেণুথায়, বাড়ীতে কে কে আছেন জিজ্ঞাসা করিলেন। মণীন্দ্র খাইতে খাইতে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিল।

তাহার পিতা ডেপুটি ও ভ্রাতা উকিল এসব না বলিয়া শুধু বলিল যে, তাহার পিতা কার্যোপলক্ষ্যে রাণাঘাটে থাকেন এবং তাহার দাদা কলিকাতাতেই কাজ করেন।

দুই জনে ঠিক আধাআধি ভাগ করিয়া সব জিনিস খাইয়া লইল। সেজন্য শীঘ্রই খাবার উঠিয়া গেল।

গৌরান্দ্র ও মণীন্দ্র পূর্বদিকে ফুটপাথের কাছেই যে জলের কল ছিল, তাহার কাছে গিয়ে জল পান করিয়া লইল। পরে রাস্তা হইতে একমুঠা ধূলা লইয়া বাটি ও রেকাবটি মাজিয়া ও গামছাখানি কাচিয়া লইয়া পূর্বস্থানে ফিরিয়া আসিল।

আচ্ছা গৌর আমি তো তোমার অর্ধেক খাবার খেয়ে ফেললাম। এবার তাহলে আমি কিছু খাবার নিয়ে আসি কিনে, দু'জনে খাওয়া যাবে।

গৌরান্দ্র বলিল—আমার আর খিদে নেই। এখন আর খাবার কাজ নেই।

গৌরান্দ্রের মা বলিলেন—এখন সামান্য যা কিছু হোক পেটে পড়েছে। এখন থাক।

কিন্তু মা আপনি আসবার আগেই যে আমরা ঠিক করে রেখেছিলাম, মা যে খাবার আনবেন আমরা দু'জনে খাব, আর কিছু খাবার কিনে দু'জনে খেয়ে নেব। বলিয়া মণীন্দ্র উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

গৌরান্দ্রের মা বলিলেন—“বাবা এখন যেও না, গৌর তো বাজারের খাবার খাবে না বাবা।”

কেন মা? আমি বেশ ভাল খাবার কিনে নিয়ে আসি দৌড়ে।

তিনি হাসিয়া বলিলেন—“না বাবা সে জন্ত নয়। বাজারের খাবারে প্রায়ই বিলিতি চিনি বা বিলিতি ছুন থাকে, সেজন্য গৌরান্দ্রের খেতে নেই।”

ওঃ! আচ্ছা আমি কিছু ফল কিনে নিয়ে আসি।” বলিয়া প্রতিবাদের সময় না দিয়া মণীন্দ্র তাড়াতাড়ি সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

একটু পরে ৪টা কমলা নেবু ও কতকগুলি আকের টিকলি আনিয়া বলিল—“এবার আর এতে তো বিলিতি কিছু নেই।”

হু’জনে তখন সেই আকের খণ্ডগুলি ও নেবু খাইয়া ফেলিল।

গৌরান্দ্র বলিল—“মা এবার তুমি তাহলে যাও। আমাদেরও ঘণ্টা বাজবার সময় হ’ল।”

মা উঠিলেন। গৌরান্দ্র মায়ের পায়ের ধূলা লইল। মণীন্দ্রও তাঁহাকে আর একবার প্রণাম করিয়া বলিল—“একদিন মা আপনাদের বাসায় গিয়ে খেয়ে আসব।”

তিনি হাসিমুখে দুইজনকেই আশীর্বাদ করিলেন। পাত্র হু’খানি হাতে তুলিয়া লইয়া মণীন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “যাবে বৈকি বাবা! তুমি যখন ধরা দিয়েছ তখন কি অল্পে ছাড়া পাবে!”

গামছায় বাঁধা পাত্র দুইটি হাতে করিয়া গৌরান্দ্রের মা সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। গৌরান্দ্র মায়ের গতিশীল মূর্তির দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। যখন আর দেখা গেল না একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “চল এবার ভিতরে যাই।”

উভয়ে দ্বারের কাছে পৌঁছিবার আগেই ঢং ঢং করিয়া সতর্ক করিবার ঘণ্টা বাজিয়া গেল।

পরীক্ষার কয়েক দিনে গৌরান্দের সহিত মণীন্দ্রের বন্ধুত্ব হইয়া গেল। পরীক্ষা যে দিন শেষ হইল মণীন্দ্র গৌরান্দেরকে বলিল—“আজ তোমাদের বাড়ী যাব।”

গৌরান্দ্র বলিল—“বেশ। আমরা এত গরীব যে আমাদের বাসায় গেলে তোমার মনের ভাব কি রকম হবে বলতে পারিনি। তা ছাড়া তুমি যদিও নিজের কথা কিছু বলনি কিন্তু আমার বিশ্বাস তোমরা রীতিমত বড়লোক।”

“কিসে তোমার এ বিশ্বাস হ’ল?”—মণীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল।

তোমার চেহারা কথাবার্তা সব ভাবেই তোমাকে বড়ঘরের ছেলে বলেই মনে হয়।

চেহারার কথা যদি বল, তাহলে বলি শোন—তুমি আর আমি যদি এক সঙ্গে থাকি আমাকে তোমার কর্মচারী বা অনুচর বলে মনে হবে। আর কথাবার্তাতেও আমি যে তোমাকে ছাড়িয়ে গেছি বলে কেউ মনে করবে না। আর আমার কথার প্রমাণের জন্য তোমার সামনে একখানা আয়না উপস্থিত করলেই হবে।

উভয়েই হাসিয়া উঠিল।

দু’জনেই এক সঙ্গেই বাহির হইল।

সুকিয়া ষ্ট্রীটে আসিয়া পূর্বমুখে খানিকটা চলিয়া দুইজনে বাঁহাতে একটি সরু গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। গলিটা যেখানে শেষ হইয়াছে তাহার কাছাকাছি আসিতেই দেখা গেল, ডান হাতে কতকগুলি খোলার বাড়ী এবং ভিতরে যাইবার একটি দরজা। প্রবেশ পথে একটি লোক

তাহার দেহে ও কেরোসিন তৈলের একটি টিন রাখিয়া পথ রোধ করিয়া বসিয়াছিল। পিছন হইতে লোকটির কাপড় পরিবার ভঙ্গী, তাহার কানের উপরাংশের স্বর্ণালঙ্কার, পায়ে বলিষ্ঠ জুতা এবং কথাবার্তার ভাষা হইতে তাহাকে পশ্চিম প্রদেশের লোক বলিয়া অনায়াসেই বুঝা যাইতেছিল। দরজার ভিতরের দিকে দণ্ডায়মান একটি ১০।১২ বছরের বালককে সে বলিতেছিল—“হমি ঔর এক পয়সাকে ভি তেল তোদের দেবে না। মাটিকা তেল মাংনি আসে, না?”

ছেলেটি নিতান্ত কাতর হইয়া বলিল—“আজ তুমি এক বোতল তেল দিয়ে যাও। দু’দিন পরেই বাবা মাইনে পাবেন, পেলেই তোমার সব দাম শোধ করে দেব।”

“তোমার বাপ তলব ত’ পাবে, হমি দামও পাচ্ছে। হমার এক মাসের বাস্তি দাম পাওনা আছে, ঔর উধার হমি দিচ্ছে না, ঔর চারটে দিন হমি দেখবে তার বাদ্ না লিস করে দিয়ে এমনি করে কান পাকড়ে টাকা আদায় করে লিব।” বলিয়া লোকটা তাহার কঠিন স্থূল হাত দিয়া বালকের একটি কান ধরিয়া একটু নাড়িয়া দিল।

ঠিক সেই সময় গৌরান্দ ও মণীন্দ্র দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তেলওয়ালার ইহাদের দেখিতে পায় নাই, কিন্তু ছেলেটি গৌরান্দকে দেখিবামাত্র কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—“দেখদিকি গৌরান্দদা তেলওয়ালার তেল ত দিলে না উল্টে আমার কানে হাত দিচ্ছে।”

বালক গৌরান্দকে সম্বোধন করিয়া কাঁদিয়া ফেলিবামাত্র তেলওয়ালার বালকের কান ছাড়িয়া দিল।”

গৌরান্দ ক্রুদ্ধভাবে বলিল—“কেন হে বাপু তুমি ঔর কানে হাত দিয়েছ? তেল বিক্রী করতে এসে এত আম্পর্কী তোমার।”

সহানুভূতি লাভ করিয়া বালকের ক্রন্দনের মাত্রা আরও

বাড়িয়া গেল। সে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল—“আমি এত করে বললুম, পরশু থেকে আমি তেল অভাবে পড়তে পাচ্ছি নে, আজকে দিয়ে যাও। তাইতে বাবাকে পর্যন্ত কি করে অপমান করলে!”

বালকের কান্না দেখিয়া মণীন্দ্র পর্যন্ত চটিয়া গেল। বলিল—“তোমার নাশিলা করা আমরা বার কচ্ছি। ভাল লোকের ছেলের গায়ে হাত তোলার জন্য আমরা তোমার নামে নাশিলা কচ্ছি। মজাটী তখন টের পাবে।”

তেলওয়ালার নরম কথা আরম্ভ করিল। কিন্তু ঐটুকু গোলমালেই দেখিতে দেখিতে এধার ওধার হইতে ১৫।১৬ জন লোক জমিয়া গেল, ব্যাপারটা কি জানিয়া লইল। কেহ বলিল—ছোট লোকের আশ্পর্কটা একবার দেখেছ? কেহ বলিল—দেয়া যাক্ বেটাকে বেশ করে চাঁটিতং করে।

একজন বলিল—শুধু ওরই দোষ দিলে হবে কেন? তেল কিনবার সখ আছে, দাম দিতে নারাজ হলে চলবে কেন?

তাই বলে ভদ্রলোকের ছেলের কানে হাত দেবে? তুমি যে একেবারে বিষ্ণুশর্মা হয়ে উঠেছ দেখছি।

ইহাদের মধ্যে একটা লোক খুব নিবিষ্টচিত্তে সব কথাবার্তা শুনিয়া যাইতেছিল। এবার সে ভিড়ের মধ্যে অগ্রসর হইয়া ছেলেটির সম্মুখীন হইয়া বলিল—“খোকা নিয়ে এস তো তেলের বোতল। যাও নিয়ে এস।”

ছেলেটা লোকটির কথার ভাবে সত্যকার ভরসা পাইয়া ভিতরে গেল ও একটু পরেই বোতল লইয়া আসিল।

“দে শীগ্গির এতে তেল ভরে” লোকটা গম্ভীরস্বরে বলিল।

তাহার কথায় এমন একটু বিশেষত্ব ছিল যে, তেলওয়ালার বিনা বাক্যব্যয়ে বোতলে তেল ভরিয়া দিল।

“আর যদি কোন দিন ভদ্রলোকের ছেলের গায়ে হাত তুলবে তো এই রকম কান ধরে এর দশগুণ জোরে তোমায় চড় লাগাব” বলিয়া লোকটা তাহার পুষ্ট হাত দিয়া তেলওয়ালার একটা কান ধরিয়া অপর হাতের দ্বারা গালের কাছে একটা মাঝারি গোছের চড় দেখাইল।

কল্লিত চড়ের একটু প্রতিবাদ করিবামাত্র অনেকে আসিয়া তাহাকে ধরিয়া দাঁড়াইল। সে তখন বেগতিক দেখিয়া তেলের টিন উঠাইয়া লইয়া সেস্থান ত্যাগ করিল।

গোরাঙ্গ ও মণীন্দ্র দুইজনে তখন বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

বাড়ীর ভিতর আসিয়া মণীন্দ্র দেখিল, বাহির হইতে সে বাড়ীটাকে যে রকম ভাবিয়াছিল, বাড়ীর মধ্যে তাহার চেয়ে অনেক বড়। উত্তর দক্ষিণ দুই দিকে সারি সারি ছোট ছোট ১২ খানি ঘর, পূর্বদিকে ২ খানি ঘর, পশ্চিম দিকে প্রাচীর, কল ইত্যাদি, মাঝখানে উঠান। সর্বসুদ্ধ ১৪টা ঘর। পাঁচটা বিভিন্ন পরিবার এই রকম ঘরে বাস করে। কেহ ১টা ঘর; কেহ ২টা, কদাচিৎ কেও বা ৩টা ঘর লইয়া আছেন। দক্ষিণ সারির পশ্চিম-পূর্বপ্রান্তে ১টা ঘর সেটা সর্বসাধারণের বৈঠকখানা রূপে ব্যবহৃত হয়। সমস্ত বাড়ীটার লোকের সংখ্যা সম্ভবতঃ ২৫।৩০ জন হইবে। কি করিয়া এতগুলি প্রাণী এইটুকু বাড়ীর মধ্যে বাঁচিয়া থাকে ইহা পল্লীবাসীর নিকট বিস্ময়ের বিষয় হইলেও সহরবাসী দুস্থ পরিবার দিকের সম্পূর্ণ পরিচিত। বীজ হইতে গাছ কি গাছ হইতে বীজ ইহা লইয়া যেমন তর্ক চলিতে পারে, তেমনি পায়রার খোপ দেখিয়া এই সব বাসা তৈয়ারি হইয়াছিল কি এই সব বাসা দেখিয়া পায়রার খোপের জন্ম হয়। তাহা গভীর গবেষণার বিষয়।

উঠানে পা দিয়াই গোরাঙ্গ ডাকিল, মা! ছোট ছোট এক দল

ছেলে মেয়ে বারন্দায় তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া ছিল। তিনি এক এক করিয়া সকলের কেশের সংস্কার করিয়া দিতেছিলেন।

পুত্রের ডাক শুনিয়া তিনি সেদিনের মধ্যে সব চেয়ে ছোট মেয়েটির কেশের সংস্কার করিতে করিতে বলিলেন, “এই যে আমি, এদিকে আয়।”

গৌরান্দ আর একটু সরিয়া আসিয়া বলিল—মা মনি আমার সঙ্গে এসেছে।

মনি এসেছে। বেশতো ডাকনা এখানে। দু’জনে ঘরের মধ্যে এসে বোস।—

পুত্রের দিকে চাহিয়া কথাটা বলিয়া তিনি মেয়েটির কেশের দিকে মন দিলেন।

গৌরান্দ যখন মনিকে সঙ্গে করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, না বলিলেন—“তোমরা একটু বস, বাবা আমার হয়ে গেল বলে।”

মেয়েটির আবার চুলে জটা বাঁধিয়া আসিতেছিল তাহা ছাড়াইতে ছাড়াইতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—“হঁয়ারে উমা লাগছে?”

হঁয়া লাগছে একটু—না লাগছে না জ্যাঠাইমা, তুমি দাও—বলিয়া মেয়েটি মাথাটি একবার সরাইয়া লইয়া আবার তাঁহার হাতে সমর্পণ করিয়া দিল।

তিনি ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “লাগছে আবার লাগছে না—এ কি রকম উমা?”

উমা কিছু উত্তর করিল না। তাহার চেয়ে একটু বড় গোছের একটি মেয়ে বলিল—“চুলে জট হয়েছে বলে ওর মা বলেছে সব চুল কাঁচি দিচ্ছে কেটে দেবে, তাই।”

“না রে না তা কখন কাটতে পারে—এমন সুন্দর চুল” বলিয়া তিনি মেয়েটিকে একটু সান্ত্বনা দিলেন।

“এই দেখ জ্যাঠাইমা ! উমি কাঁদছে”—একটি মেয়ে বলিল ।

“তাই নাকি ? দেখি ? ছিঃ উমা !” বলিতে না বলিতে উমা ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল ।

ফোঁপানির মধ্যকার কথাগুলির মধ্যে এইটুকু বুঝা গেল যে, সে মাকে কতদিন বলিয়াছে, চুল বাঁধিয়া দিবার জন্য কিন্তু মা দেন নাই ; আর এখন তিনি বলিতেছেন যে তাহার চুল কাটিয়া দিবেন । চুল কাটিয়া পাঠশালায় পড়িতে গেলে লোকে তাহাকে কি বলিবে ?

গোরাঙ্গের মা তাহার চোখ মুছাইয়া আদর করিয়া বলিলেন—তুই রোজ বিকেলে আমার কাছে আসিস মা, আমি তোঁর চুল বেঁধে দেব । বলিয়া তাহার চুল বাঁধা সমাপ্ত করিয়া গামছা দিয়া মুখখানি মুছাইয়া সম্মুখের কোঁটা হইতে একটি টিপ লইয়া তাহাকে পরাইয়া দিলেন ।

উমা দুঃখ ভুলিয়া প্রসন্ন মুখে সরিয়া বসিল । অপর একটা মেয়ে তাহার স্থানে আসিল । ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে তাহার চুল বাঁধাও হইয়া গেল । তখন সকলে উঠিয়া গেল । গোরাঙ্গের মা ভিতরে আসিলেন ।

গোরাঙ্গ বলিল—মা, মণি আজ রাতে এখানে ভাত খেয়ে তবে যাবে । আমি ভেবেছিলুম ও আমাকে খেতে বল্চে তার বদলে নিজে খেতে এল ।

মণীন্দ্র বলিল—“এখানে বামুনের হাতে ক’দিন রান্না খেয়ে আমার অরুচি ধরে গেছে তার তোমাকে খেতে বলব কি ! সে যে রান্না, তা আর চিবনো যায় না । আজ যে তরকারী রেঁধেছিল সেটা চচ্চড়ি কি স্ক্রুত তা বলে না দিলে বুঝবার উপায় ছিল না ।” বলিয়া মণীন্দ্র হাসিয়া উঠিল ।

তারপর আবার বলিল—“এখন তো আমি দু’দিন মার হাতে খেয়ে নি । তার পর মা যদি অনুমতি করেন তোমাকে রাণাঘাটে নিয়ে যাব । সেখানে গিয়ে মার হাতের রান্না তোমাকে খেতে বলব ।”

“মণি ঠিক কথাই বলেছে। আচ্ছা তোমরা তাহলে গল্প কর, আমি কাপড় কেচে আসি।” তিনি চলিয়া গেলেন।

“তুমি ততক্ষণ ওই বইটা একটু দেখ আমি আসছি” বলিয়া ‘ভক্তিব্যোগ’ বইখানি মণির হাতে দিয়া জামা জুতা খুলিয়া খালি পায়ে খালি গায়ে গৌরান্ধ বাহিরে আসিল।

মিনিট :৫ কাটিয়া গেল তখনও গৌরান্ধ ফিরিল না দেখিয়া মণীন্দ্র বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। সে জানিতে পারে নাই বাহির হইতে যে অনেকগুলি কুতূহলী মুখ তাহার পানে উকিঝুঁকি মারিতেছিল। যাহাকে দেখিতেছিল তাহার সঙ্গে চোখোচোখি হইবামাত্র কয়েকটি যুবতী ও মেয়ে চুপ চুপ শব্দ করিতে করিতে পলাইল।

একটি মেয়ে তখনও সেইখানে দাঁড়াইয়া ছিল। মণি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—“গৌরান্ধ কোথায় গেল জান ?”

মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “জানি, ওই যে ওই ঘরে, পূজোর ঘরে। যাওনা তুমি। জুতো খুলে যেয়ো যেন।” বলিয়া পূর্বদিকের একটি ঘর দেখাইয়া দিল।

কতকটা একা বসিতে ভাল লাগিতেছিল না বলিয়া কতকটা গৌরান্ধ কি পূজা করে জানিবার জন্ত মণীন্দ্র ধীরে ধীরে সেই ঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরের দুয়ারটি অর্ধেকের বেশী ভেজান ছিল। ভিতর হইতে ধূপ ধূনার গন্ধ ও কুঞ্চিত ধূমের রেখা দেখা যাইতেছিল।

নিঃশব্দে মণীন্দ্র ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দুয়ারটি যেমন ছিল তেমনি রাখিয়া দিল।

প্রথমে ভিতরটা ঈষৎ অন্ধকার মনে হইয়াছিল। পরক্ষণে মণীন্দ্র ঘরের মধ্যকার সব দেখিতে পাইল, খালি দেওয়ালের মাঝামাঝি জায়গায় একজনের একখানি তৈলচিত্র রহিয়াছে। আর তাহার সম্মুখে

মৃত্তিকাসনের উপর গৌরান্ধ্র ধ্যানস্তিমিত নেত্রে বসিয়া আছে। তাহার সুন্দর ঠোঁট দু'খানির মধ্যে অতি ঈষৎ যেন ভাবের আঘাতে নড়িতেছিল আর দুই চক্ষু জলের ধারা বহিতেছিল।

ফটোখানির পানে চাহিয়া দেখিল অতি সুন্দর সুপুরুষ এক যুবকের আকৃতি। সে তৈলচিত্রের পানে চাহিয়া গৌরান্ধ্রের পানে চাহিলে মনে হয় ঐ মূর্ত্তি যাহার তিনিই ছবি হইতে বাহির হইয়া এই বালকের মূর্ত্তি ধরিয়া মৃত্তিকার উপর বসিয়াছেন। যিনি ঐ ছবি খানিতে মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়াইয়া আকাশের দিকে যুক্তকর উঠাইয়া প্রার্থনা করিতেছিলেন, তিনিই এইখানে নামিয়া আসিয়া তরুণ মূর্ত্তিতে বসিয়া প্রার্থনায় মন দিয়াছেন।

নিঃশব্দে মণীন্দ্র ছবি ও মানুষের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বকের মধ্যে কিসের একটি অব্যক্ত ঈষৎ কম্পাবেগ সে অনুভব করিল। তাহার দেহ বার বার শিহরিয়া উঠিল। দু'টা চক্ষু সজল হইয়া আসিল।

১৭

শয়ন-ঘরে ফিরিয়া আসিয়া গৌরান্ধ্র বলিল, “ওখানি আমার বাবার ছবি।”

মণীন্দ্র বলিল—“আমি দেখিবামাত্র বুঝিতে পেরেছিলাম। উনি কোথায় থাকেন!”

গৌরান্ধ্রের মাকে দেখিয়া মণীন্দ্র বুঝিয়াছিল, যে গৌরান্ধ্রের পিতা জীবিত।

গৌরান্ধ্র একটু ভাবিয়া বলিল—

মাকে আগে জিজ্ঞাসা করে আসি।

তারপর উঠিয়া মায়ের কাছে রান্নাঘরে গেল।

ফিরিয়া আসিয়া বলিল—“মা বলতে অনুমতি দিয়েছেন। বলি শোন।”—

‘বাবা কোথায়’ এ প্রশ্নের উত্তরে গৌরাঙ্গকে উঠিয়া মায়ের কাছে যাইতে দেখিয়া মণীন্দ্র বিস্মিত হইয়াছিল। গৌরাঙ্গ কি বলে শুনিবার জন্ম সে গৌরাঙ্গের মুখের পানে সাগ্রহে চাহিয়া রহিল।

গৌরাঙ্গ বলিতে লাগিল :—আমি তোমাকে বাবার সম্বন্ধে যা বলব তার অর্ধেক আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানা আর অর্ধেক মার কাছ থেকে শোনা।

আমার বাবা ওকালতি করতে আরম্ভ করেছিলেন, তাতে খুব পসারও হয়েছিল। কিন্তু যেমন স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হ’ল, তিনি ওকালতি ছেড়ে স্বদেশীর প্রচার কার্য নিলেন। যখন শ্রীশ্রী কলেজ প্রতিষ্ঠা হ’ল, তিনি তাতে অধ্যাপকের কাজ নিলেন।

ঠাকুমা, মা, বাবা, ও আমি দেশ থেকে কলকাতা এলাম।

আমার বয়স তখন আট বছর। সব কথা স্পষ্ট মনে নেই। তার কারণ এত বেশী ও বিভিন্ন প্রকারের ব্যাপার এক সঙ্গে দেখেছিলাম যে আমার শিশুচিত্ত সে সবার স্পষ্ট ধারণা করতে পারত না।

কলেজের কাজ শেষ করেই বাবা এখানে সেখানে বক্তৃতা দিতে বার হতেন। তখন চারিদিকেই সভাসমিতি। সকল সভারই চেষ্ঠা হ’ত বাবাকে সভাপতি করা অন্ততঃ বাবাকে উপস্থিত করানো। মাঝে মাঝে বিভিন্ন জেলা ও এমন কি গ্রামে গ্রামে তাঁকে যেতে হ’ত। এসব ছুটির সময় যেতেন।

তাঁর বক্তৃতায় সমস্ত বাংলা দেশে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। তিনি যা বলতেন, তার উদ্দীপনা লোকের মনে কিছুকাল বিপুল বেগে কাজ করত।

বাড়ীতেও তাঁর কাজের অন্ত ছিল না। কত লোকে তাঁর কাছে আদেশ নিতে, উপদেশ শুনতে আসতেন তার সংখ্যা ছিল না।

ঠাকুমা সময়ে সময়ে অনুযোগ করতেন—এত খাটলে শরীর টিকবে কি করে ?

বাবা, মিষ্টি হেসে তাঁকে বোঝাতেন, মা তুমিই তো আমাকে দেশের কাছে সঁপে দিয়েছ, এখন ফিরে চাইলে চলবে কেন !

একটা জিনিস বাবার ভিতরে ছিল তার মর্যাদা তখন বুঝতে পারিনি, এখন পারি। সভার জয়ধ্বনি তাঁরি নামে জয়ধ্বনি শুনে শুনে লোকের প্রশংসায় অভিনন্দিত হয়ে ফিরে এসে খানিকক্ষণ বাবা উপাসনা করতেন ! তাঁর দুই চোখ দিয়ে জল পড়ত আর বলতেন—এ সব গৌরব তোমার দয়াময়। যে কাজ তুমি আমার দিয়ে করাচ্ছ, যে কথা তুমি আমার দিয়ে বলাচ্ছ তা আমি কোন দিন কল্পনাও করিনি। এ প্রশংসা, এ জয়লাভ যেন আমাকে বিচলিত না করে। তোমার পায়ে আমার মাথা যেন চিরদিন নত থাকে।

তাঁর নিজের তৈরি এই ভাবের গান তিনি যখন ঘরের মধ্যে একা গাইতেন, বাহিরে থেকে মা ও ঠাকুমা শুনতেন, আর তাঁদেরও চোখ দিয়ে জল পড়ত। আমি সব জিনিসটা বুঝতে পারতাম না। তবু চোখের জল দেখে যখন আমারও চোখে জল আসত, ঠাকুমার কোলে মুখ লুকাতাম।

কোন খানে যাবার আগে সুধু খানিকক্ষণের জন্তু নির্জন ঘরে একবার বসতেন। আমরা বাহিরে থেকেই বুঝতে পারতাম, তিনি মাটিতে বসে চোখ বুঁজে হাত যোড় করে ভগবানের কাছে যা বললে দেশের কল্যাণ হবে, তাই বলবার প্রার্থনা করছেন। সভায় কিছু বলবার আগে উঠে দাঁড়িয়ে একটুখানির জন্তু একবার চোখ বন্ধ করতেন, যেন মনে মনে ভগবানের আদেশ নিতেন।

তার পর ধীরে ধীরে কথা বলতে আরম্ভ করতেন।

তিনি যা বলতেন তার ভিতরে হিংসার কথা কিছু মাত্র থাকত না। তিনি বলতেন বিলাসিতা ছেড়ে দাও, দেশের শিল্প ও সকল বিষয়ে সরল জীবন ফিরাইয়া আন। সত্যকে বরণ কর, আর নির্ভীক হও।

তাঁহার কথা ছিল সামান্য কিন্তু তাঁর শক্তি ছিল অসাধারণ। সে শক্তি যেন আগুনের মতো সঙ্গে সঙ্গে লোকের মন থেকে জড়তা, ভীকতা, বিলাসিতা পুড়িয়ে দিত।

কত লোকে বাড়ীতে এসে তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করত। নিজের গত জীবনের ভুল-ভ্রান্তির কথা বলে নূতন জীবন যাপন করবার ইচ্ছা জানাত। তিনি বলতেন, তিনি তাদের পরামর্শ দিতেন, কিন্তু তারা পেত শক্তি।

শোনা গেল তাঁর বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু বলবার না থাকলেও তাকে নাকি বন্দী করা হবে কারণ তাঁরই বর্ত্তার কালে দেশে অশান্তির বৃদ্ধি হচ্ছে।

যাবার কিন্তু কিছুমাত্র উদ্বেগ বা চিন্তা ছিল না। কিন্তু তাঁকে রক্ষার জন্ত তাঁর ভক্ত অনুরক্ত লোকজনেরও আয়োজনের অন্ত ছিল না। পুলিশের লোক এসে কতবার ফিরে গেল, বাবা বাড়ী ফেরেননি অথ কোথাও আছেন। পুলিশের লোকগুলো যখন ক্লান্ত হয়ে ফিরে যেত, তখনি কোথা থেকে তারা বাবাকে ফিরিয়ে আনত। কি করে তারা দশদিকের খবর রাখত, ভেবে আমি আবাক হয়ে যেতাম।

একদিন বাবা কোথায় বেরুবেন বলে উপাসনায় বসেছেন, এমন সময় শোনা গেল—পুলিশ এসে বাড়ী ঘেরাও করেছে। আমি ছুটে ছাদের ওপর গিয়ে দেখলাম বাড়ীটার চারিদিকে পুলিশ এমন করে ঘিরেছে যে, কোন দিক দিয়ে আর পালাবার পথ নেই।

একটু পরেই একখানি মোটরকার এসে ছুয়ারে দাঁড়াল দু তিন জন সাহেব ও বাঙ্গালী উচ্চপদস্থ পুলিশের কর্মচারী নেমে এসে ওয়ারেন্ট হাতে বাবার খোঁজ করলেন।

সকলেই বুঝলেন অনেক দিনের চেষ্টা বিফল হওয়ার জন্য আজকে এই ব্যবস্থা হয়েছে। শুনলাম স্বয়ং কমিশনার সাহেব গাড়ীতে এসেছেন।

বাবাকে খবর দেওয়া হল। তিনি শান্ত মুখে ঘর থেকে বার হয়ে মাকে ঠাকুমাকে বললেন—তোমরা ভেবনা, আমি আবার ফিরে আসব। আমার মনের মধ্যে ভগবান্ বলছেন—এখনও আমার কাজ আছে।

বাবা ধীরে ধীরে বাইরে গেলেন। মা ঠাকুমা বাবার সামনে চোখের জল ফেলেন নি। তিনি বাইরে যাবামাত্র ঠাকুমা আমায় কোলে নিয়ে কঁকে চেপে ধরে ঝর ঝর করে কাঁদতে লাগলেন। মার চোখের জলে ঠাকুমা; মা ভিজে উঠলেন।

আমার বুকটা যেন ফেটে যেতে লাগল। একটু পরেই আমি কোল থেকে নেমে এলাম! দেখলাম—একজন সাহেব বাবার হাতে একখানা কি লেখা কাগজ দিলে সেখানার দিকে একবার মাত্র চেয়ে তারই হাতে ফিরিয়ে দিলেন। তারপর সাহেবের পিছনে পিছনে এসে গাড়ীতে বসলেন। আর একজন সাহেব যে সব পুলিশ বাড়ী ঘিরে ছিল, তাদের সর্দারকে কি বলে গাড়ীতে উঠে গাড়ী চালিয়ে দিল। মোটর চলে যেতেই এক এক করে তারাও সব চলে যাবার উদ্যোগ করছে, এমন সময় দু'খানা মোটর এসে উপস্থিত, তাতেও পুলিশের সাহেব কর্মচারী ও দেশীয় কর্মচারীরা ছিলেন। যখন তারা শুনলে যে, বাবা এইমাত্র চলে গেছেন এবং তাঁকে নিয়ে গেছেন বড় সাহেব, তখন তাদের যা ক্ষোভ ও আক্ষেপ এবং পুলিশের ওপর যা রাগ ও আশ্ফালন তা আমার অনেককাল মনে থাকবে! তারা তখন সেই মোটর খানার উদ্দেশ্যে তখনি বেরিয়ে গেল।

তখন জানা গেল যারা বাবাকে নিয়ে গেছে তারা বাবার দলেরই লোক ; জাল পুলিশ সেজে ঐরকম করে বাবাকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে গেল । সে রাত্রে আমার মনে হর্ষ বিষাদের ছন্দ চলেছিল ।

তারপর ৬ মাস বাবার সঙ্গে দেখা হয় নি । খবর পেতাম বাবা বাংলা দেশের আজ এখানে কাল সেখানে এমনি করে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন । বক্তৃতা দেবার পরমুহুর্তে তাঁকে নিয়ে তাঁর লোকেরা কোথায় চলে যাচ্ছে তা কেউই জানতে পারছে না । পুলিশ তো নয়ই ।

ঠাকুমার কাছে মার কাছে বাবার পত্র মাসে একখানা করে আসত । পত্রে কোন ঠিকানাই থাকত না ।

ছ'মাস কেটে যাবার পর হঠাৎ বাবার পত্র আসা বন্ধ হয়ে গেল । তাঁর বক্তৃতার কথাও আর শোনা যেত না । একটা বছর কেটে গেল । বাবার কোনই খবর নেই । ঠাকুমা কাঁদতেন । মার চোখেও মাঝে মাঝে জল দেখতাম ।

যে তেজে যে শক্তিতে “স্বদেশী” আরম্ভ হয়েছিল তা আর রইল না । ক্রমে লোকে দামের তুলনা করে সস্তায় বিলিতি কাপড় নিশ্চিন্ত মনে কিনতে আরম্ভ করলে । জিনিস ভাল এই যুক্তিতে বিলিতি সখের জিনিস কিনতে লজ্জাবোধ করলে না । কলকাতাতে এটা আমরা বেশ বুঝতে পারলাম ।

এই রকম সময় একদিন হঠাৎ বাবা ফিরে এলেন । তাঁর মুখেই শুন্লাম বাবাকে ধরবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল সেজন্য বাবাকে যারা ভালবাসেন তাঁদের অনুরোধে বাবা প্রকাশ্যভাবে কোথাও বার হতে পারেন নি কিন্তু সব বৃথা ।

তারপরের কথা বলতে বাবার চোখে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল । বাবা বললেন—দেশের লোকে সব ভুলে গিয়েছে । ত্যাগের

যা গৌরব, সংঘের যা শক্তি সব তারা পরিত্যাগ করেছে। আর তাদের বলা বৃথা।

মা জিজ্ঞাসা করলেন—এখন কি পুলিশে তাঁহাকে আর অনুসরণ করবে না।

বাবা উত্তর দিলেন—খবর পাবামাত্র তাহারা তাঁহাকে ধরবে এবং বিচারে তাঁহার হয় জেল নয় দীপান্তর অনিবার্য।

মার ভয়ের সীমা রহিল না। কেন তবে এখন তিনি আসিলেন!

বাবা তখন তাঁর মনের উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

আজ শেষবার তিনি সভায় দেশের লোককে সম্বোধন করিবেন ও শেষ চেষ্টা করিবেন। পুলিশে তাঁহাকে ধরবে, তিনি তাহার জন্ম প্রস্তুত। তাঁহার জীবনের সাধনা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে—আর বাঁচিয়া কি ফল? লোকের মনের সে তেজ চলিয়া গিয়াছে, তাহারা পূর্ব প্রতিজ্ঞা সব ভুলিয়াছে। তিনি ধরা দিবেন—শাস্তি গ্রহণ করিবেন। লোকের মনে পূর্ব কথা যদি তাঁহার এই শেষ চেষ্টায় জাগরুক হয়।

সেই একটা রাত্রি বাবা আমাদের কাছে থাকিলেন। সে রাত্রি কাহারও চক্ষে নিদ্রা আসিল না।

সকালেই কলেজ-স্কোয়ারের সভা। বাবা উপাসনা শেষ করিয়া ঠাকুমাকে প্রণাম করিলেন, মায়ের পানে অতি প্রসন্ন শান্ত দৃষ্টিতে চাহিলেন, আমার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

তারপর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

সেদিনকার সভাতে বাবার আগমন কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম, তেমন বক্তৃতা তিনি আর কোন দিন দেন নাই, এমন লোক কম ছিল, যে সেদিন কাঁদে নাই।

তিনি বলিয়াছিলেন, তোমরা ভগবানকে ভুলিয়াছ, দেশকে ত্যাগ

করিয়াছ ; আমি তাই ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য আজ ফিরিয়া আসিয়াছি । একটু পরেই আমি বন্দী হইব । বিচারে যদি আমার ফাঁসী হয় আমি তৃপ্ত হইব । আমার শাস্তির স্মৃতি যেন তোমাদের মনে স্বদেশীর কথা জাগাইয়া রাখে । যদি আমার নির্বাসন বা কারাবাস হয়, সেখানে আমি যে দুঃখ ভোগ করিব সেই দুঃখের অগ্নি যেন তোমাদের চিত্তে সত্যের আলো জ্বলাইয়া রাখে ।

পুলিশ ততক্ষণে খবর পাইয়াছিল । যেমন বাবা বক্তৃতা শেষ করিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছেন তৎক্ষণাৎ সশস্ত্র পুলিশ তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল । বিনা প্রতিবাদে তিনি তাহাদের সঙ্গে গেলেন ।

তারপর বিচার হইল । যিনি একটি পীপীলিকারও ইচ্ছা করিয়া প্রাণ নষ্ট করেন নাই, মিথ্যাকে যিনি আজীবন ঘৃণা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার নামে নানা ষড়যন্ত্র অপরাধ আরোপ করিয়া তাঁহাকে দীর্ঘ কারাবাস দণ্ড দেওয়া হইল । বাবার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে ! যেদিন ধরে নিয়ে গেল সেইদিন থেকে এক সম্প্রদায়ের লোকের মনে সত্যিকারের দেশসেবার ভাব জেগেছে । হাজার বক্তৃতাতে যা হয়নি, একজনের আত্মত্যাগে তা হয়েছে । বাবার নাম বোধ হয় শুনেছ—বুদ্ধদেব গঙ্গোপাধ্যায় ।

গোরাঙ্গ চুপ করিল । দু'জনের চোখেই তখন জল ।

হঠাৎ উভয়েই দুয়ারের পানে চাহিয়া দেখিল, অশ্রুসজল চক্ষে মা দাঁড়াইয়া ।

কখন তিনি আসিয়াছিলেন দু'জনের কেহই তাহা জানিতে পারে নাই ।

গৌরান্ধ ও মণীন্দ্র বিকালের ট্রেনে রাণাঘাটে আসিয়া নামিল। অনেক দিন গৌরান্ধ কলিকাতার বাহিরে আসে নাই। ট্রেনে আসিতে আসিতে দুই পাশে কোথাও গভীর জঙ্গল, কোথাও আম কাঁটালের বাগান, শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র, গোচারণ ভূমি ওই সব দেখিয়া বড়ই আনন্দ পাইয়াছিল।

ষ্টেশনের বাহিরে আসিতেই কাকের কলরবে গৌরান্ধের চিত্ত আকৃষ্ট হইল। এক সঙ্গে এত কাক ও তাহাদের সম্মিলিত এত প্রচণ্ড কোলাহল সে আর কখন শুনে নাই। সেখানকার যতগুলি গাছ সব গাছের প্রতি পাতায় যেন একটি করিয়া কাক বসিবার আয়োজন করিতেছে। তাহারা বসিতেছে, উড়িতেছে, আবার বসিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ভাষায় যেন বাদানুবাদ করিতেছে!

রাস্তায় পড়িয়া মণীন্দ্রের পশ্চাৎ দক্ষিণ দিকের পথ ধরিয়া গৌরান্ধ বলিল—মনে হচ্ছে, যেন এ দেশের যত কাক সব এক সঙ্গে জড় হয়েছে—গায়ের ভেতর এত জায়গা থাকতে এই ষ্টেশনের কাছেই এত কাকের আড্ডা কেন?

মণীন্দ্র হাসিয়া কহিল—“কাকেদের মনের কথাটা ঠিক বলা শক্ত। ষ্টেশনের কাছে ট্রেনে করে যাতায়াতের সুবিধা হবে বলে বোধ হয়।” দুই বন্ধু হাসিতে হাসিতে চলিতে লাগিল।

একটু পরেই উভয়ে ডানধারে পশ্চিম দিকের পথ ধরিল।

গৌরান্ধ বলিল—লক্ষ্য করলে দেখা যায় এদের ভেতরেও বেশ দল বেঁধে কাজ করবার চেষ্টা আছে।

মণীন্দ্র বলিল—অস্তুতঃ ওদের মধ্যে যে একতা আছে—তার প্রমাণ দেখতে পাবে যদি কোন গতিকে একটা কাক ধরে বেঁধে রাখতে পার।

গৌরাজ্জ বলিল—তা বটে। তা হলে রাজ্যের যত কাক জুটে কা কা করতে শুরু করে দেবে—ভাবটা এই—ছেড়ে দাও বেচারাকে,—আর কেন কষ্ট দেওয়া ?

মণীন্দ্র বলিল—সকাল হতেই ওরা উঠে দল বেঁধে যে কার্যস্থলে চলে যাবে। শুনেছি ওরা নাকি মাঠে গিয়ে অন্য কোন শস্য যা যখন পায় খেয়ে কাছাকাছি নদী বা পুকুর থেকে জল পর্য্যন্ত খেয়ে তবে বাসায় ফেরে।

কথায় কথায় দুইজনে আর একটা মোড় ফিরিয়া আবার দক্ষিণ দিকের পথ ধরিল।

সেই পথে খানিকটা অগ্রসর হইতেই একটা শো শো শব্দ দুইজনে শুনিতে পাইল।

গৌরাজ্জ জিজ্ঞাসা করিল—এ किसের শব্দ ?

মণীন্দ্র বলিল—ঝাউ গাছের। এবার আমরা এই সামনের মোড় ফিরব। ওই রাস্তার ছ'ধারে ঝাউ গাছ—ওই যে দেখা যাচ্ছে !

দুইজনে শীঘ্রই মোড় ফিরিয়া উক্ত রাস্তায় পড়িল।

গৌরাজ্জ বলিল—বেশ শব্দ, একটা বেশ বিষন্ন অথচ গভীর ভাব আছে।

মণীন্দ্র বলিল—বাবা বলেন, দূর থেকে সমুদ্রের শব্দের সঙ্গে এর মিল আছে।

একটু পরেই তাহারা বাঁ দিকে দেওয়ানি ও ফৌজদারী কোর্ট ফেলিয়া মণীন্দ্রদের বাসার সম্মুখস্থ ময়দানে আসিয়া পৌঁছিল।

এখানে মণীন্দ্র একটু আগে আগে চলিল ; গৌরাজ্জ গতি একটু মন্থর করিয়া ইচ্ছা করিয়া কিঞ্চিৎ পিছাইয়া পড়িল।

দূর হইতে শান্তি মণীন্দ্রকে দেখিবামাত্র বারান্দা হইতে তাড়াতাড়ি

নামিয়া আগাইয়া আসিতে আসিতে বলিল—এত দেৱী করলে যে ছোটদা ? পরীক্ষা তো কবে শেষ হয়ে গেছে ।

হঠাৎ মণীন্দ্রের পিছনে গৌরাজের দিকে দৃষ্টি পড়ায় বিস্মিত হইয়া স্তব্ধ হইয়া গেল । দেখিল অতি সুন্দর এক যুবক দাদার পিছন হইতে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া আছে ।

শান্তির সমস্ত মুখখানি লজ্জায় ক্ষণকালের জন্য অরুণোদয়ের মত রাঙা হইয়া উঠিল ।

একবার ভাল করিয়া গৌরাজকে দেখিয়া লইয়া সে তাড়াতাড়ি বাসার দিকে ফিরিল ।

মণীন্দ্র পিছন হইতে কহিল—

চলো কেন শান্তি ? এ হচ্ছে আমার সেই নতুন বন্ধু গৌরাজ । একে লজ্জা করতে হবে না ।

শান্তি ততক্ষণে বারান্দায় পৌঁছিল ও একবার বিছাতের মত পিছন ফিরিয়া উভয়কে দেখিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল ।

শান্তির লজ্জা ও বিমুগ্ধ দৃষ্টিটুকু গৌরাজের কাছে বড়ই মিষ্ট লাগিয়াছিল । সেই মুখ ও মিষ্ট চাহনির কথা ভাবিতে ভাবিতে গৌরাজ মণীন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল ।

পরদিন সন্ধ্যাকালে বড় ঘরটায় সকলে একত্র বসিয়াছেন । শান্তির প্রথম লজ্জার ভাবটা কাটিয়া গিয়াছে । ঘরটির একধারে উষা, ইন্দু ও শান্তি খোকাকে লইয়া বসিয়া আছে । শান্তি এখনও কথাবার্তায় দোষ দিতে আরম্ভ করে নাই । তবে মন দিয়া সব কথা শুনিতোছে ।

গৌরাজ মণীন্দ্রকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পুত্র জানিয়া প্রথমটা একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল । তাহার নিজেদের ক্ষুণ্ণ অবস্থা, জীর্ণ বাসগৃহ মণীন্দ্রকে দেখাইবার পর তাহাদের সহিত এই সুন্দর সুসজ্জিত বাসভবন, স্বচ্ছল অবস্থা দেখিয়া সে কিছুক্ষণের জন্য বিমর্ষ হইয়াছিল । কিন্তু সকলের অমায়িক ব্যবহার মণীন্দ্রের মাতার অকৃত্রিম স্নেহ ও মমতা মণীন্দ্রের বন্ধুত্ব ও শান্তির সুন্দর মুখ ও সুমিষ্ট কাহিনী তাহার মনের বিরুদ্ধ ভাব ধীরে ধীরে দূর করিয়া দিল ।

মণীন্দ্র কলিকাতা হইতে পত্রে গৌরাজের কথা সামান্য কিছু লিখিয়াছিল । গত রাত্রে কোন একটা সময়ে মা বাবা বৌদিদির কাছে মণীন্দ্রের গোপনে কি করিয়া গৌরাজের সহিত পরিচয় হইয়াছে এবং কি করিয়া সেই পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছে সেই সমস্ত বলিয়াছিল । গৌরাজের পিতার নাম শুনিয়াই সুরেশবাবু তাঁহাকে চিনিয়াছিলেন । শান্তিও দুয়ার হইতে সব কথা শুনিতো পাইয়াছিল ।

সকলেরই গৌরাজের উপর একটি সন্ত্রমের ভাব ও মমতা জন্মিয়াছিল । স্বেচ্ছায় ষাঁহারা দারিদ্র্য বরণ করেন, তাঁহাদের সন্ত্রম লোকের মনে আপনা হইতে আসে ।

সুরেশবাবু মাসিক পত্র বাছিয়া কয়েকটি ভাল কবিতা পড়িয়া সবাইকে শুনাইলেন । গৌরাজের ভাল লাগিবে ভাবিয়া “স্বদেশ” হইতে কয়েকটি কবিতা পড়িলেন ।

তারপর হাসিয়া বলিলেন,—আর একটি অতি নবীন কবির লেখা তোমাদের পড়ে শোনাব। বলিয়া এক খণ্ড কাগজে লেখা একটি কবিতা পড়িলেন।

কবিতার নাম মায়ের স্নেহ।

অতি সরল মধুর ভাষায় লেখা। একটা ছোট মেয়ের জ্বর হইয়াছিল। মা সব কাজ ছাড়িয়া মেয়ের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছেন। ছোট দু'খানি হাত দিয়া সে মায়ের হাত ধরিয়া কখন যুমাইত, কখন অজ্ঞান হইয়া পড়িত। যখন সে চক্ষু মেলিত, দেখিতে পাইত—মায়ের চক্ষু তাহার উপরে অমৃত বর্ষণ করিতেছে। ডাক্তার বলিয়া গেল, মেয়ের জীবনের আশা নাই। সকলেই আশা ছাড়িল। পিতা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। দাদারা চক্ষু মুছিলেন। মা কিন্তু আশা ত্যাগ করিলেন না, মেয়ের শয্যাপার্শ্বে ছাড়িলেন না। মেয়ে যেন স্বপ্নের ঘোরে দেখিত, কে তাহার পাশে যুক্ত করে বসিয়া প্রার্থনা করিতেছে, কখন তাহার চক্ষে অশ্রু ঝরিতেছে, কখন আশার আভাস ফুটিয়া উঠিতেছে। তাঁহাকে দেখতে যেন অনেকটা তাহার মায়েরই মতো—কিন্তু অতি সুন্দর।

তারপরে যাহার জীবনের কোন আশাই ছিল না, সেই মেয়ে বাঁচিয়া উঠিল—ধীরে ধীরে সে যেন গভীর দীর্ঘনিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল। বহুকাল পরে মায়ের শীর্ণ মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

গৌরান্ধ ব্যতীত আর সকলেই বুঝিল এ লেখা কাহার। সুশীলাসুন্দরীর দুই চক্ষু বাহিয়া শুনিতে শুনিতে কতবার জলে ভরিয়া আসিয়াছিল। শান্তিরই কয়েক বৎসর আগে খুব অসুখ হইয়াছিল, বাঁচবার আশা প্রায় ছিল না। ডাক্তার পর্যন্ত সেবার বলিয়াছিলেন যে, কেবল মায়ের গুশ্রম্বার জোরে মেয়েটি বাঁচিয়াছে।

সুরেশবাবু এ কবিতাটি পড়িবার সময়ে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কবিতা শেষ করিয়া তিনি বলিলেন—“তোমরা সবাই প্রায় বুঝেছ এ কবিটি কে। যদি কেউ না বুঝে থাক তো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ঐ যে মেয়েটি এই ঘরের এক কোণে গিয়ে বসেছে, কিন্তু মন ঠিক মাঝখানে, যার কপালের উপর কঁোকড়া কঁোকড়া চুল এসে পড়েছে, মুখখানিতে বেশ একটু লাল আভা ফুটে উঠেছে এবং এইমাত্র যে লজ্জায় মাথা নীচু করেছে সেই মেয়েটিই আজকের কবি; এখন বল কেমন হয়েছে?”

সকলেই শান্তির পানে চাহিয়া মূহু মূহু হাসিতে লাগিল। গৌরান্দ্র প্রশংসমান দৃষ্টিতে শান্তির পানে চাহিল। ঠিক সেই মুহূর্তে শান্তিও নতমুখ তুলিয়া একবার গৌরান্দ্রের পানে চাহিয়াই গৌরান্দ্রকেও তার পানে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া আরও লজ্জিত হইয়া চক্ষু নত করিল। নূতন অতিথিটি কি ভাবিতেছে ইহার একটা অনুমান করিবার জন্মই সে তাহার দিকে চাহিতে গিয়া এইভাবে ধরা পড়িয়া গেল। কিন্তু গৌরান্দ্র যে প্রশংসার চক্ষেই তাহার পানে চাহিয়াছিল, তাহা এই কিশোরীটির চক্ষু এড়ায় নাই।

মণীন্দ্র প্রথম কথা কহিয়া বলিল—বেশ কবিতা হয়েছে। শান্তি যে এমন পারে তা জান্তাম না।

উষা বলিল—ঠাকুরঝি কালে একজন বেশ ভাল কবি হবে। আরও অনেক কবিতা ঠাকুরঝি লিখেছে। ‘ছুদিনের বন্ধু’, কবিতাটিও খুব সুন্দর। আর—

উষা আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল কিন্তু শান্তির লজ্জা ও মিনতি-পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিতে সে থামিয়া গেল।

সুশীলাসুন্দরী চোখের জল মুছিয়া ফেলিলেন। তিনি তখনি কিছু বলিতে পারিলেন না, বলিবার প্রয়োজনও ছিল না।

গৌরান্দ বলিল—খুব সুন্দর হয়েছে। পরক্ষণেই সে এই ভাবিয়া লজ্জিত হইল, যে একদিন আসিয়াই একটা কিশোরীর সম্বন্ধে এতটা প্রশংসা করিবার স্বাধীনতা লওয়া হয়ত উচিত হয় নাই।

সুরেশবাবু বলিলেন—সত্যই খুব সুন্দর হয়েছে। এবং ছন্দ, মধুর ভাব ও প্রকাশের ভঙ্গী খুব স্বাভাবিক, শান্তির কবিতা চর্চা করা উচিত।

তারপর আরও অনেক কথাবার্তা হইতে লাগিল।

খানিক পরে সুরেশবাবু কহিলেন—তোমাদের আজ আমি আরও একটা নূতন খবর দেব। এইখানে, যেখানে আমরা কবিতার চর্চা করছি অনেক ভাল ভাল কাব্যের আলোচনা ও জন্ম এখানে হয়েছে।

সকলে জিজ্ঞাসু ভাবে সুরেশবাবুর পানে চাহিল।

সুরেশ বাবু বলিলেন—কবি নবীনচন্দ্রের নাম তো শুনেছ। তিনি এক সময়ে এখানে ছিলেন। এখানে থাকতে থাকতেই তাঁর কুরুক্ষেত্র লেখা। হয়ত এই ঘরে বসে তিনি কত কাব্য লিখেছেন, সামনের এই মাঠে পাইচারি করতে করতে হয় ত কত নতুন নতুন ভাব তার মাথার ভেতর ফুটে উঠেছে।

আর কেহই একথা জানিত না। ক্ষণেকের জন্য সকলেরই মনে হইল, কুরুক্ষেত্রের কবির কাব্য কথা যেন এখনও এই কক্ষমধ্যে সঙ্গীতের রেশের মতো জাগিয়া আছে।

সুরেশবাবু বলিলেন—এক সময়ে এই কবির সঙ্গে দেখা করতে আর দু'জন লোক এসেছিলেন তাঁদের দু'জনকেই তোমরা চেন। একজন কবি রবীন্দ্রনাথ আর একজন হীরেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের গান পর্য্যন্ত এখানে হয়ে গেছে।

সকলেরই মনে এই বাসাটির উপর বেশ একটু সম্ভ্রমের সঞ্চার হইল।

সে রাত্রে শয়নের পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গৌরান্দ ঘুমাইতে পারে নাই।

শান্তির মধুর কবিতা ও তাহার ততোধিক মধুর সেই সময়কার লজ্জাকর মুখখানি বার বার মনে পড়িয়া তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত করিয়াছিল।

শান্তিও রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছিল আবার যেন কবিতা পড়া হইতেছে, পিতার অনুরোধে সে নিজে কবিতাটি পাঠ করিতেছে। কবিতা সকলেরই ভাল লাগিয়াছে। সকলে যখন ঘর হইতে উঠিয়া গিয়াছেন, শান্তি সেই কবিতার কাগজখানি আপন মনে দেখিতেছে, এমন সময় পিছন হইতে গৌরঙ্গ আসিয়া তাহার উপর হাত রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিল—তোমার কবিতা অতি সুন্দর হইয়াছে। তোমার আরও কবিতা আছে আমাকে শুনাইবে না?

এক অপূর্ব পুলকের বিদ্যুৎ তাহার মনের উপর দিয়া খেলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঘুমও ভাঙ্গিয়া গেল।

জাগিয়া উঠিয়া শান্তি গৌরঙ্গের সুন্দর মুখছবি মনে করিল। সে ভাবিল, যদি গৌরঙ্গ তাহাকে সব কবিতা গুলি দেখাইতে বলে, তাহা হইলে সে তাহা দেখাইবে। কিন্তু গৌরঙ্গ তাহার হাতের উপর হাত রাখিয়াছিল কেন? তবে সে তো স্বপ্ন! সে সব যদি সত্যকার হইত তাহা হইলেও সে রাগ করিত না। সেই সুন্দর স্পর্শের অনুভূতি এখনও যেন তাহার হাতের উপর লাগিয়া রহিয়াছে।—কয়েকটি সুন্দর সুগন্ধ ফুলের পাপড়ি যেন সেখানটিতে ঝরিয়া পড়িয়াছিল, পুষ্প পরাগ মাখিয়া যেন একটি রঙিন প্রজাপতি হাতের ঐখানটিতে আসিয়া বসিয়াছিল!

চার পাঁচ দিন পরে গৌরান্দ্র বলিল, যে মা একা আছেন, আর দেৱী না করিয়া সে কালই চলিয়া যাইবে।

তথাপি সকলেরই অনুরোধে গৌরান্দ্রকে আরও ৩৪ দিন থাকিতে হইল এবং এই কয়দিন সকলেরই বড় আনন্দে কাটিল। প্রতি সন্ধ্যায়, সকালে বসিয়া গল্প, পাঠ, ও গানে তন্ময়চিত্ত হইয়া আনন্দ লাভ করিতেন। গৌরান্দ্রের গান, মণীন্দ্রের গানে শান্তির কবিতা সকলেরই মনোরঞ্জন করিত। অনেকগুলি কবিতা লিখিয়া ফেলিয়াছিল এবং সকলই অতি মধুর ও সুন্দর হইয়াছিল। শান্তি যেন কোথা হইতে একটি প্রেরণা অনুভব করিয়াছিল তাহার শক্তি তাহার কবিতার মধ্যে সুস্পষ্ট বুঝা যাইত। যৌবন তাহার দেহ ও মন ভরিয়া যেন পুষ্পের মতো ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল। এ কি তাহারি প্রভাব না আরো কিছু?

গৌরান্দ্রের প্রতি সকলেই সমধিক আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার স্বদেশী আহার, স্বদেশী পরিচ্ছদ, অত্যন্ত সরল ও শাদাসিদা অভ্যাস, তাহার দেশানুরাগও পিতামাতার প্রতি ভক্তি সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। মণীন্দ্র যখন দেশভক্তির গান গাহিত, তখন গৌরান্দ্রের মুখভাব প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত, পিতার কথা বলিতে তাহার মুখে গৌরবের আভা ফুটিত, চক্ষু সজল হইয়া আসিত। মায়ের কথা বলিতে তাহার অশ্রু ঝরিত। পিতার যেদিন হইতে পঞ্চদশবৎসরের জন্ম নির্বাসন হয়, সেই দিন হইতে তাহার মাকত কষ্ট করিয়া তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার মনের গভীর দুঃখ গোপন করিয়া কেমন করিয়া দিবারাত্র আপনাকে কাজের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন, একদিন সে সুব কথা বলিতে বলিতে গৌরান্দ্র সকলকেই অশ্রু সজল করিয়া তুলিয়া আপনি কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল।

গৌরাঙ্গ চা পান করিত না। মাছমাংস খাইত না। ভাল বা মূল্যবান খাণ্ড খাইতে চাহিত না? বিশেষ উপরোধ করিয়া সুশীলাসুন্দরী দু একদিন তাহাকে ভাল খাণ্ড খাওয়াইয়াছিলেন, কিন্তু লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, তাহাতে সে যেন কষ্ট পাইয়াছিল।

ভাল জলখাবার দিতে গেলে সে বলিত, আমি এসব কখন খাইনে, খেতে ভালও লাগে না।

শান্তি একদিন জিজ্ঞাসা করিল, আপনি তাহলে কি খাবার খান?

গৌরাঙ্গ বলিল—ছোলা ভিজান থাকে তাই একমুঠো খাই।

শান্তি কিছু বিস্মিত হইয়া বলিল—তাহার সঙ্গে আর কিছু থাকে না? 'না'।

খেতে ভাল লাগে?

বেশ তো লাগে। ভাতও তো আমরা রোজ খাই, ভাল লাগে না!

রোজ এক খাবার তাই বলছি।

তাও লাগে। আমার মা আবার তাও খান না। খাই আর খাবার সময় ভাবি এমন কত লোক আছে, যাদের আবার এও জোটে না।

এই কথাবার্তার পরদিন শান্তি চা ছাড়িয়া দিল। একটা পাথর বাটিতে একদিন একমুঠা ছোলাও ভিজাইয়া ছিল; কিন্তু উষার কাছে ধরা পড়িয়া গিয়া লজ্জায় খাইতে পারে নাই। মণীন্দ্রও দুই দিন পরে চা ছাড়িয়া দিল।

গৌরাঙ্গ আসার পর সাতদিন কাটিয়া গিয়াছে। আজ সন্ধ্যার ট্রেণে গৌরাঙ্গ কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবে। মায়ের জন্ম তাহার মন কেমন করিতেছিল, সেজন্ম এখানে সকলের সঙ্গে তাহার ভাল লাগিলেও আর থাকিতে পারিতেছিল না।

অপরাহ্নে সুরেশবাবু কাছারী হইতে আসিবার পর-ই সুশীলাসুন্দরী বসিয়া থাকিয়া গৌরাজকে জলযোগ করাইলেন। আজ আর ভাল জিনিস খাইব না এ আপত্তি তাহার টাঁকে নাই। সুশীলাসুন্দরী, সুরেশবাবু গৌরাজকে আবার আসিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। বলিলেন—তিনি একবার শীঘ্র তাহার মায়ের সঙ্গে দেখা করিবেন।

যাত্রার সময়ে সকলেরই মন কেমন করিতে লাগিল। মেয়েদের চক্ষু ছল ছল করিতেছিল।

সুরেশবাবু ও মণীন্দ্র গৌরাজকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিবার জন্ত সঙ্গে গেলেন। আর সকলে সম্মুখের মাঠ পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিয়াছিলেন। শান্তি কেবল বারান্দার এককোণে ম্লান মুখে দাঁড়াইয়া গৌরাজের যাওয়া দেখিতেছিল।

সে রাত্রে শান্তি অসুস্থতার দোহাই দিয়া সন্ধ্যার পরেই শুইয়া পড়িয়া-ছিল। গৌরাজ চলিয়া যাওয়াতে সে কোন দোষ খুঁজিয়া পাইতেছিল না ; কিন্তু ইহারই জন্ত বৃকের মধ্যে এত দুঃখ কেন জমা হইয়া উঠিতেছে ? ঘরের আলোটা নিভাইয়া দিয়া বালিশে মুখ লুকাইয়া খানিক ক্ষণ চোখের জল ফেলিয়া তবে শান্ত হইল।

বাড়ী সুদূর সবাই যখন নিদ্রিত, সে রাত্রে তখনও শান্তি ভাবিতেছিল—এতক্ষণ গৌরাজ কি করিতেছেন ? হয়ত এখনও রাত্রি জাগিয়া মায়ের সঙ্গে গল্প করিতেছেন। গৌরাজ কি আর সকলের সঙ্গে শান্তির নামও মায়ের সঙ্গে করিতেছেন না ?

গৌরাজ তাহার নাম করিতেছে এই কথা মনে হইতেই তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। চক্ষু আবার সজল হইয়া আসিল।

শান্তি গৌরাজের অতি সুন্দর মুখখানি ভাবিতে ভাবিতে অনেক রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িল।

দুই বৎসর পরের কথা। গৌরান্দ্র ও মণীন্দ্র দুই জনই বৃত্তি লাভ করিয়া কলিকাতায় একই কলেজে এফ-এ পড়িতেছে। সুরেশ বাবুও একটু চেষ্টা করিয়া কলিকাতায় বদলি হইয়াছেন। ভবানীপুরে বাসা করিয়া সকলে আছেন। উষার আনন্দ আরও বাড়িয়াছে। ইন্দু স্কুলে ভর্তি হইয়া পড়িতেছে। শান্তিও খুব আনন্দে আছে—কারণ, সে প্রায়ই গৌরান্দ্রকে দেখিতে পায়। গৌরান্দ্রদের সহিত সকলেরই ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়াছে। স্মৃশীলাসুন্দরী অনেকবার গৌরান্দ্রদের বাসায় গিয়া তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তিনিও অনেকবার আসিয়াছিলেন।

শান্তি ১৭ বৎসরে পড়িতে চলিয়াছে। তাহার দুই একটা সম্বন্ধ আসিতেছে, কিন্তু তেমন মনোমত হইতেছে না। হঠাৎ একদিন শুনা গেল—একটি খুব ভাল পাত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পাত্র এম-এ পাশ এবং খুব সম্ভব নমিনেশনে ডেপুটি হইবে—পিতা রায় বাহাদুর ও সুরেশ বাবুর পুরাতন বন্ধু। শীঘ্রই একদিন শান্তিকে দেখিতে আসিবারও কথা হইল।

সেই রাত্রে উষা স্বামীর সহিত পরামর্শ করিল।

উষা বলিল—আচ্ছা এ পাত্র কি ভাল হবে ?

ফণীন্দ্র। তা না দেখলে কি করে নিশ্চয় করে বলা যাবে। শুনতে ত মন্দ নয়।

উষা। আমার কিন্তু মোটেই ভাল লাগছে না। কবে আসবে তারা ?

ফণীন্দ্র। আসছে সোমবারে।

উষা। বারণ করে দিলে হয় না? কেন মিছামিছি আসবে !

ফণীন্দ্র । কি রকম ?

উষা । শান্তির বে ও সব জায়গায় হওয়া মুশ্কিল । হলেও ও সুখী হবে না ।

ফণীন্দ্র । কথাটা একটু স্পষ্ট করেই বল । বাধাটা কি ?

উষা । কিছু দেখতে পাও না, চোখ দু'টো আছে কেবল চশমা পরবার জন্য ।

ফণীন্দ্র মূঢ় হাসিয়া জিজ্ঞাসুভাবে স্ত্রীর পানে চাহিল । উষা তখন কুসুমি বালিকা, শান্তি গৌরান্দকে খুব ভাল বাসে । সে আজকাল এত ভাল লিখতে পারে, ভাল ভাল মাসিক পত্রে তার কবিতা ছাপা হচ্ছে তারও কারণ এই । গৌরান্দকে ভালবাসার পর থেকে তার কবি প্রতিভা বেড়ে গেছে । আমি তার কয়েকটা কবিতা লুকিয়ে দেখেছি সেগুলো সে ছাপায়নি । সেগুলো সব গৌরান্দকে লক্ষ্য করে লেখা ।

তখন দু'জনে অনেকক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ চলিল, দু'জনের বিবাহ হইতে পারে কি না ।

তখন ফণীন্দ্র বালিকা, তুমি তবে মাকে বলিও ।

উষা বালিকা—তুমি বাবাকে বলিও ।

শেষটা স্থির হইল, বাবা মা দু'জনকেই বলিতে হইবে এবং দু'জনকে বলিবার ভার দুইজনের উপরই পড়িল ।

সুরেশ বাবু শুনিয়া ক্ষণকালের জন্য একটু চিন্তিত হইলেন ।

সুশীলাসুন্দরী বলিলেন, আমারও মনে হয় বোনার কথাই ঠিক ।

সুরেশ বাবু ভাবিতে লাগিলেন ।

সুশীলাসুন্দরী ভাবিলেন, স্বামী গৌরান্দের দরিদ্র অবস্থার কথাই ভাবিয়া চিন্তিত হইয়াছেন । বলিলেন—ছেলেটি অবশ্য সব বিষয়ে ভাল বস্তু হইবে । অবস্থা খারাপ ; তা হক্, সাবিত্রী তো গরীব জেনেই

সত্যবানের গলায় মালা দিইছিল। শান্তির যদি অদৃষ্টে থাকে, ওই থেকে গৌরান্ধ বড় হবে।

সুরেশ বাবু বলিলেন—আমি এ কথাটা তত ভাবছি। গৌরান্ধ যে রকম ছেলে, যে রাস্তাতেই ও যাক, তাতেই ও বড় হবে। প্রথম কথা হচ্ছে—গৌরান্ধের মা রাজী হবে কি না।

রাজী হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি দেখেছি গৌরান্ধরও শান্তির উপর বেশ টান হয়েছে। কথাবার্তা কইছে এমন সময় শান্তি এসে পড়লে ওর মুখ কেমন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে দেখনি?

আরও একটা কথা আছে এর মধ্যে তবে তার জন্তে আমি তেমন ভাবিনে।

কি কথা বল।...

গৌরান্ধর ভেতর যে স্বদেশী ভাব আছে, তাকে আমি শ্রদ্ধা করি সন্দেহ নেই—তবে আমার এই চাকরির সঙ্গে ওটা ঠিক খাপ খাবেনা।

খাপ খাবেনা কেন, তুমি মনে করছ। সেই স্বদেশীর সময় কতলোককে পুলিশ পিকেটিং অপরাধে ধরে এনে হাজির করেছিল, তুমি ত সাহসের সঙ্গে প্রমাণ অভাব বলে ছেড়ে দিইছিলে। কতলোক আবার সামান্য সামান্য কারণে বাছাদের জেলেও দিইছিল। আর বন্ধিমবাবু ডিপুটি হলেও বন্দেমাতরং লিখে গিয়েছেন।

সেই জন্ত হয়ত তাঁকে অত প্রতিভা স্বত্বেও ডেপুটি রয়ে যেতে হইছিল। যাক তার জন্ত ভাবিনে, না হয় শেষটা কাজ ছেড়েই দেব।

তা বৈকি। আর এখন ঠাকুরপো রোজগার কচ্ছেন...হরির ইচ্ছায় ফণী কিছু আনছে। এখন আর তোমার ভাবনা কি? শান্তির বিয়েটা হয়ে গেলে আর তো কোন দায়ই নেই।

তারপর দু'জনে মিলিয়া ঠিক করিলেন, অন্ততঃ শান্তিকে দেখিতে আসিবে

একথাটা বাড়ীতে একটু রাষ্ট্র করিয়া দেওয়া যাক। তাহা হইলে ব্যাপারটা কতদূর গড়াইয়াছে তাহা বুঝা যাইবে তখন সেই মত ব্যবস্থা করা হইবে।

শান্তি যখন শুনিল, তিনদিন পরে তাহাকে দেখিতে আসিবে এবং হয়ত সেই পাত্রকেই মনোনীত করা হইতে পারে, সে একেবারে অকূল পাথার দেখিল।

উষার কাছে সে সজলচক্ষে গিয়া বলিল, বৌদিদি—তুমি মাকে বল, আমি এখন বিয়ে করব না। এখনও কিছু দিন পড় ব।

উষা বলিল—সেই জন্তেই ত তোমার জন্ম একজন ভাল মাষ্টার খোঁজ করা হচে যিনি পড়াটাকে বেশ মিষ্টি ও সরস করে দেবেন।

তুমিও বৌদিদি আমার সঙ্গে এই রকম করে ঠাট্টা করছ। আমাকে তাড়াতে পারলেই তোমরা সবাই তাহলে বাঁচ।

বলিয়া শান্তি কাঁদিয়া ফেলিল।

উষা যখন শান্তির চোখ মুছাইয়া বলিল—“ছিঃ ভাই, একটা ঠাট্টা সহিতে পার না। আর এলেই বা দেখতে তারা আইবুড় মেয়েকে কত জায়গায় থেকে দেখতে আসে তাই দেখতে এলেই কি বিয়ে হয়? আসে আসুক না, একটিবার দেখেই চলে যাবে।”

না বৌদিদি আমি যখন এখন বিয়েই করব না, তখন এসব অনর্থক কেন?

আচ্ছা সত্যি করে বলতো ঠাকুরঝি! তোমার এখন বিয়ে করতেই মন নেই, না আর কাউকে মনে মনে ভাল বাস। আমাকে বল আমি কাউকে বলব না।

শান্তি মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

শান্তির কাছ ঘেসিয়া বসিয়া তাহাকে বাহুর মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল—“আচ্ছা, গৌরাজ যদি তোকে বিয়ে করতে চায় তো কি বলবি?”

শান্তি এবারও কিছু বলিল না কিন্তু তাহার চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল ।

উষা বলিল—“গৌরাজ্জকে ভালবাসিস্ । নয় ?”

শান্তি তাহার উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন চাপিবার জন্য উষার কোলে মুখ লুকাইল ।

উষার চক্ষেও জল আসিয়াছিল । সে শান্তিকে বাহর বাঁধনে বাঁধিয়া মাঝনা দিতে লাগিল ।

২২

পরদিন সুরেশ বাবু বলিলেন—“ফণী, কৈলাশ কিছু দিনের জন্য দার্জিলিং গেছে, সেখান থেকে ফিরেই বিবাহের কথা ঠিক করতে আসবে । কৈলাশ খুব সুপাত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু আগে গৌরাজ্জের সঙ্গে চেষ্টা করে দেখা কর্তব্য । যদি গৌরাজ্জের মায়ের মত না হয়, তখন এইখানেই ঠিক করতে হবে ।”

ফণী বলিল—“আমার মনে হয় গৌরাজ্জের মায়ের কোন অমত হবে না ।”

আমার তা মনে হয় না । তার কারণ গৌরাজ্জের বাবা এখন বোধ হয় পাঁচ বছর দ্বীপান্তরে থাকবেন । হয়ত গৌরাজ্জের মা বলবেন, এ পাঁচ বছর না গেলে গৌরাজ্জের বিয়ে দেওয়া তাঁর উচিত হবে না । শান্তিকে পাঁচ বছর সেই আশ্বাসে রাখা কি উচিত হবে ?

কথাটা ফণীজ্জের মনে লাগিল । ফণীজ্জ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—“তবু তো চেষ্টা করে দেখা যাক একবার ।”

সেইদিনই সুনীলাসুন্দরী ও উমা মিলিয়া গৌরাজ্জদের বাড়ী আসিলেন ।

গৌরান্দের মায়ের কাছে সুনীলাসুন্দরীই কথাটা পাড়িলেন, কিছুক্ষণ তিনি একটু বিমনা হইয়া রহিলেন ; পরে বলিলেন—“এর চেয়ে গৌরান্দের বেশী সৌভাগ্য আর কিছু হতে পারে না। তোমরা তাকে ভালবাস বটে খুব ; তবু এতখানি যে করতে চাইবে, তা ভাবিনি। কিন্তু দিদি, আমার অদৃষ্টের কথা ত জান। আর পাঁচ বছর পরে তিনি ফিরবেন। তার আগে আমার এত বড় আনন্দটা ভোগ করা কি ঠিক হবে ? তা নইলে এর চেয়ে সুখের কথা তো কিছু নেই দিদি।”

কথাটার সঙ্গে সঙ্গে গৌরান্দের মায়ের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

উষা আগেকার রাত্রে বঙ্গগারটা গৌরান্দের মাকে বলিল।

গৌরান্দের মা সব শুনিয়া বলিলেন “আচ্ছা মা আমি আজকের রাতটা ভেবে কাল একথার উত্তর তোমাদের বাসায় গিয়ে দিয়ে আসব।”

দিনের সমস্ত কাজ শেষ করিয়া সন্ধ্যার পর গৌরান্দের মা পূজার ঘরে আসিয়া দুয়ার বন্ধ করিলেন। স্বামীর তৈল চিত্রের সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া একদৃষ্টে চিত্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ধূপ ধূনার সুরভিত, কক্ষ স্তিমিত প্রদীপের আলোক যেন কোন্ সুদূর শান্তিময় স্বপ্নরাজ্যে রূপান্তরিত হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ সেই চিত্রের মুখপানে চাহিয়া থাকিতে তাঁহার দুই চক্ষে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। চক্ষে সে চিত্র লুপ্ত হইয়া অন্তর আলোকিত করিয়া ফুটিয়া উঠিল। তখন ভূমিতলে মাথা লুটাইয়া করযোড়ে তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন।

আমায় আজ তুমি বলিয়া দাও, আমি কি করি। কত কাল তোমায় দেখি নাই, কত বৎসর তোমার একছত্র লেখাও পাই নাই ; তবু তোমার মুখপানে চাহিয়া আছি। তুমি সেই বন্ধুহীন আত্মীয়হীন দ্বীপান্তরে কত কষ্ট পাইতেছ ইহা ভাবিয়া সংসারে ষ সুখ যে আমার অসহ হইতেছে।

গৌরান্দের মঙ্গল কিসে হইবে আমার চেয়ে তুমি বেণী জান । তুমি আমার বলিয়া দাও, আমার বুঝাইয়া দাও আমি কি করিব । তোমাকে ছাড়িয়া গৌরান্দের বধু আনিয়া সংসার আমি কোন প্রাণে করিব ? আর গৌরান্দ যদি শান্তিকে ভালবাসিয়া থাকে, কোন প্রাণে আমি তাহাকে কঠিন হইয়া বলিব না বিবাহ হইবে না ।

তুমি এস—আমি এভার একা বহিতে পারি না । তুমি আসিয়া তোমার ভার লও । যদি না আস, আমার দয়া করিয়া বলিয়া দাও—আমি কোন পথে যাই । বল—আমায় দয়া কর ।

বুঝি এমনি করিয়া ডাকিলে এতখানি আকুলতা আসিলে দূর দূরান্তর-স্থিত আত্মার সহিত আত্মার মিলন হয় । চক্ষুে বাহাকে দেখা যায় না সেই বাস্তবিকে অন্তরে পাওয়া যায় । ভুলুষ্ঠিতা পূজারিণীর ধীরে ধীরে বাহুজ্ঞান চলিয়া গেল । সেই লুপ্ত বাহু জ্ঞানের অন্তরালে বহুক্ষণ কাটিয়া গেল ।

যখন তাঁহার জ্ঞান হইল, তখন চক্ষুর জলে বসন ভিজিয়াছে, মৃত্তিকা কেমন হইয়াছে, আর হৃদয় শান্ত শীতল হইয়াছে । এই ধ্যানের মধ্য দিয়া তিনি যেন স্বামীর অন্তরের বাণী শুনিয়াছেন ।

পরদিন সন্ধ্যাকালে গৌরান্দের মা গৌরান্দকে সঙ্গে করিয়া পদব্রজে মণীন্দ্রের মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। গৌরান্দ লজ্জায় মাকে ভিতরে পৌছাইয়া দিয়া মণীন্দ্রের পড়িবার ঘরে চলিয়া গেল—মণীন্দ্রের বিশেষ অনুরোধেও বাড়ীর মধ্যে গেল না।

সুশীলাসুন্দরী গৌরান্দের মায়ের হাত ধরিয়া বলিলেন, এস দিদি এস। উষা ভাড়াভাড়া আসন পাতিয়া দিল।

আসন কেন আবার মা। দিবিয়া মেজে, আমি মেজেতেই বসছি। পায়ে যে ধুলো। ইন্দু একঘটি জল ও গামছা আনিয়া পা ধুয়াইয়া দিতে গেল। গৌরান্দের মা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “থাক মা—থাক মা আমিই ধুচ্ছি।” বলিয়া পা ধুইয়া আসনটার পার্শ্বেই বসিয়া পড়িলেন। সুশীলাসুন্দরীর মনে পড়িল, মণীন্দ্র একদিন বলিয়াছিল, জ্যেঠাইমা কখন গাড়ীতে চড়েন না, ভাল খান্না না।

গৌরান্দের মা বলিলেন—আমি আজ সে কথাই বলতে এসেছি। কিন্তু শান্তি মা কোথায় গেল? একবার শান্তিমার সঙ্গে দেখা করে শেষে বলব দিদি

শান্তি তখন ঠিক পাশের ঘরেই তাঁহারই কথা শুনিবার জন্য দুরু দুরু হৃদয়ে বসিয়াছিল। সুশীলাসুন্দরী সেই কক্ষ দেখাইয়া দিতে তিনি সেখানে আসিয়া দেখিলেন শান্তি নতমুখে একখানি বই হাতে মেজের উপর বসিয়া। তাঁহাকে দেখিয়া শান্তি “সসম্মুখে দাঁড়াইয়া উঠিতে তিনি বলিলেন—“ব’স মা বস। লজ্জা কি মা! আমি তোমার মা। একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। বেশ করে ভেবে তার উত্তর দিও মা।”

শান্তি নতমুখে উৎকর্ষ হইয়া রহিল ।

তিনি বলিলেন—সাবিত্রী যেমন সত্যবান্ গরীব ও অন্নাগ্নি জেনেও তাঁর গলায় মালা দিইছিলেন, তুমিও মা তেমনি গৌরান্দের অনুগামিনী হয়েছ । সুধু একটা কথা ভেবে দেখো মা—গৌরান্দ্র চিরদিনই গরীব থাকবে, হয়ত অনেক দুঃখ অনেক বিপদ তাকে মাথা পেতে নিতে হবে । তুমি রাজা বাপের মেয়ে, কত সুখের সংসারে—ঐশ্বর্যের মাঝখানে—তোমার স্থান হতে পারে । সে সব ছেড়ে এই গরীবের ঘরে আসার জন্ত তোমার কোনদিন অনুতাপ হবে না তো মা ?

শান্তি উত্তর দিবার একটু চেষ্টা করিল—কিন্তু ছোট্ট একটি না কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না, সে সুধু নতজানু হইয়া গৌরান্দের মায়ের পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল এবং বিগলিত অশ্রুধারায় তাহার পা দু’টি সিক্ত করিয়া দিল । তিনি স্নেহে শান্তিকে উঠাইয়া সজল চক্ষে তাহার মুখ চুম্বন করিয়া তাহার আর্দ্র চক্ষু মুছাইয়া দিয়া কহিলেন—“অনুতাপ করবার মেয়ে তুমি নও মা—অনেক ভাগ্যে তোমাকে পাব ।”

গৌরান্দের মাতা শান্তিকে লইয়া পূর্বকার কক্ষে আসিয়া বলিলেন—“তোমার এই মেয়েটিকে আমি নিলাম আজ থেকে । তবে যে রত্ন রাজার ঘরে শোভা পেত, তুমি তাই ভিখারীকে দিলে দিদি ।

সুশীলাসুন্দরীর মুখ হর্ষোজ্জ্বল হইয়া উঠিল । শান্তি লজ্জায় আর মাথ । তুলিতে পারিতোঁছিল না । উষা কক্ষান্তরে গিয়া শান্তিকে একা পাইয়া সাদরে তাহার চিবুক নাড়িয়া দিয়া বলিল—“এবার তাহলে ঠাকুরঝি একটিবার শাঁক বাজিয়ে দিই ।

গৌরান্দের মাতা স্বামীর অবগতির জন্য পত্র দিলেন—ও বিবাহের জন্য অনুমতি চাহিলেন। যথাসময়ে উত্তর আসিল। তিনি আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দিয়াছেন। সুধু লিখিয়াছেন—তোমার জ্ঞান ও কর্তব্য বুদ্ধির উপর কাছে থাকিয়াও আমি চিরদিন নির্ভর করিয়া আসিয়াছি। আজ দূরে থাকিয়া কিছুতেই তাহার ব্যতিক্রম হইতে দিব না।

একমাস পরে ফাল্গুন মাসের প্রথমের দিকেই বিবাহের দিন স্থির হইল। গৌরান্দের মায়ের অনুরোধে বিবাহে কোন প্রকার আড়ম্বর হইল না। যেটুকু নহিলে নয়, কেবল তাহাই হইল। মণীন্দ্র বরপক্ষে চলিয়া আসিল, গৌরান্দ্রকে আগাইয়া লইয়া চলিল। ফণীন্দ্র কন্যাপক্ষে দেখিতে লাগিল।

কোন বাণ্ড নাই, আলোক নাই, সজ্জা নাই এ অবস্থায় গৌরান্দ্র মণীন্দ্র ও পুরোহিত সঙ্গে বিবাহ করিতে আসিল।

বিবাহের রাত্রে সুরেশবাবুও কোনরূপ বাহাডম্বর করেন নাই। রাত্রে উৎসবের মধ্যে কেবল শানাইয়ের ব্যবস্থা ছিল। সন্ধ্যা হইতে বিবাহ হওয়া পর্য্যন্ত সময়টুকু সুধু শানাই বাজিয়াছিল। শানাই যেন অতি মধুর স্বরে ডাকিয়া বলিতেছিল—এস বর, এস বধু, তোমরা পরস্পরকে গ্রহণ কর, দু'জনে আজ হইতে হাত ধরাধরি করিয়া জীবনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ না হউক তাহাতে যেন আনন্দের অভাব না থাকে, পথে যেন পাখীর গান, গাছের ছায়া, মুকুলের গন্ধ, কুসুমের রূপ তোমাদের আনন্দ বিধান করে। তোমাদের পরস্পরের সঙ্গে যেন তোমাদের কাছে সব চেয়ে বড় সম্পদ হয়।

বিবাহ শেষ হইয়া গেলে শানাই কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইয়া শেষরাত্রে—

আবার তাহার সুরে সকলের চিত্ত প্রাবিত করিতে লাগিল। এবারকার সুর যেন কারুণ্যভরা। যেন শানাই অতি করুণ স্বরে বলিতে লাগিল যাহাকে এতকাল বক্ষের তপ্তনীড়ে মানুষ করিয়াছ—আজ তাহাকে বিদায় দাও। মুখে যদি হাসি না আনিতে পার, চক্ষের জল টুকু মুছিয়া ফেলিও। শানাইয়ের এই মধুর করুণ সুর যাহার কাণে গেল, তাহারি হৃদয় সানন্দ ও ব্যথায় ভরিয়া গেল। পিতামাতার চক্ষে অশ্রু আনিল, ভ্রাতার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল, বাসর-শয়নে শুইয়াও বরবধুর হৃদয়ে বেদনানুরঞ্জিত আনন্দের সঞ্চার করিল।

প্রভাতে বরবধু বিদায় লইয়া আপন গৃহে আসিল। গৌরান্দের মা বধুকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। আনন্দের মধ্যেও তাঁহার বেদনার অন্ত ছিল না। যে ঘরে গৌরান্দের পিতার আলোকচিত্র ছিল, সেই ঘরে কুশণ্ডিকা আরম্ভ হইল—সেই চিত্রের পানে চাহিয়া মন্ত্র পড়িবার সময় দু'জনেরই মনে হইতেছিল, যেন ঐ চিত্রের মূর্তি সজীব হইয়া তাহাদের পানে চাহিয়া আছেন ও তাঁহার নয়ন হইতে অশীর্ষাদ ঝরিতেছে।

গৌরান্দের মা ছুয়ারের নিকট দাঁড়াইয়া এক একবার ছবির পানে চাহিতেছেন ও ভাবিতেছেন, আজ যদি ইনি উপস্থিত থাকিতেন এত দুঃখের মধ্যেও আনন্দের অবধি থাকিত না। পাড়ার দুই চারিটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আজ এখানে থাইবে, সে ব্যবস্থা করিতেছেন, আর এক একবার কাণ পাতিয়া কি যেন শুনিতেছেন। যেন মনে হইতেছে, যে পদ শব্দ অনেকদিন অনেক বৎসর শোনেন নাই—তাহাই যেন ছুয়ারে আসিয়া নামিল—যে কর্ণস্বর অনেক দিন কাণে যায় নাই, সেই মধুর স্বরে কে যেন বলি বলি করিতেছে—এই যে আমি আসিয়াছি।

কুশণ্ডিকা শেষ হইয়া গেল। পুরোহিত আহাৰাদি করিয়া চলিয়া গেলেন। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আনন্দ করিতে করিতে আহাৰ

সমাপন করিল। দূর হইতে উকি মারিয়া ও কাছে আসিয়া তাহারা বধূকে বারকয়েক দেখিল। ‘ওরে খুব সুন্দর বৌ; আবার কাল এসে দেখব’ বলিয়া ছুটিয়া পলাইল।

গৌরান্দ্র দেখিল—মা আজ বড়ই উন্মনা আছেন—হাতে কাজ করিতেছেন, কিন্তু চক্ষু কণ্ণ যেন আর কোথাও পড়িয়া আছে। বহু দূরে যেন কাহাকে দেখিতেছেন—বহু দূর হইতে যেন কাহার কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিবে সেই প্রত্যাশায় তাঁহার সারা চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে।

কলিকাতার কৰ্ম্মক্রান্ত দিন শেষ হইয়া চলিয়াছে। পাড়ার কয়েকটি গৃহিণী বধূ দেখিয়া একান্ত চিত্তে বধুর প্রশংসা করিয়া গেলেন। পাশের বড় বাড়ীগুলিতে একে একে আলো জলিয়া উঠিল। ছোট ছোট বাড়ীগুলি হইতে শব্দধ্বনি শুনা গেল।

গৌরান্দ্র বলিল, মা তুমি এবার কিছু খাও। শান্তি খাবার আনিতে উদ্ভত হইল। মা বাধা দিয়া বলিলেন, “আরও খানিকটা যাক্ মা। আজ যেন আমি কিছুতে স্থির হতে পাচ্ছিনে।”

হঠাৎ বাহিরের দুয়ারে একটা শব্দ হইল। গৌরান্দ্রের মা চমকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। “দেখ তো বাবা—বলিয়া দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দিলেন; আর যেন কথা যোগাইলনা।

গৌরান্দ্র বাহিরে যাইবার পূর্বেই এক আগন্তুক বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাহার মাথার কেশ ছোট করিয়া ছাঁটা, দীর্ঘ কৃশ দেহ একখানি শুভ্র বস্ত্র খণ্ডে আবৃত। মুখে প্রসন্ন দৃষ্টি; তাহাতে গভীর শান্তি, বিপুল শক্তি ও অসীম সহিষ্ণুতার লেখা ফুটিয়া রহিয়াছে।

আগন্তুককে দেখিবামাত্র গৌরান্দ্রের মাতা ‘এতদিনে এলে’ বলিয়া ছুটিয়া তাঁহার পদতলে অর্দ্ধ মূর্চ্চিত হইয়া পড়িলেন।

গৌরান্দ্র ক্ষণকালের জন্ত তাঁহার মুখপানে চাহিয়া ও পরক্ষণে তাঁহার

পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। শান্তিও স্বামীর অনুসরণ করিল।

ইনিই বুদ্ধদেব, গোরাক্ষের পিতা। সুদীর্ঘ কারাবাস শেষ হইবার পূর্বেই হঠাৎ অতর্কিত মুক্তি, পাইয়া গৃহে ফিরিয়াছেন। বুদ্ধদেব পুত্র ও পুত্রবধুর মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন; বলিলেন, “তোমাদের আশীর্বাদ করবার জন্যই ভগবান্ আমাকে সহসা মুক্তি দিয়েছেন।”

পরে অতি স্নেহভরে স্ত্রীর হাত ধরিয়া উঠাইয়া গৃহমধ্যে আনিয়া বসাইলেন। স্নিগ্ধ ও মধুরস্বরে বলিলেন, “বড় কষ্টই পেয়েছ জাহ্নবী।”

স্বামীর কারাবাসে ক্লিষ্ট ও ক্লশ দেহের পানে ভাল করিয়া চাহিতে জাহ্নবীর দু’টি চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। অতি ধীরে মৃদুকণ্ঠে বলিলেন আজ সকাল থেকে আমার কেবল মনে হয়েছে—তুমি আস্ছ, তুমি আস্ছ। আর আমাকে একা ফেলে যেওনা।

২৮

কারাগারে বুদ্ধদেবের বৎসর কয়েক কষ্টের অবধি ছিলনা। আজ এ জেলে কাল ও জেলে এই করিয়া তাঁহার ৩৪ বৎসর কাটিয়াছিল। যখনই এক জেলে নানা কষ্ট ও প্রতিকূল অবস্থায় তিনি আপনার চিন্ত স্থির করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—তখনই তাঁহাকে অন্যস্থানে সরানো হইতেছিল। শেষে তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, কারাগার সর্বত্রই সমান—একটি বৃহৎ কারাগারের এক একটি কক্ষ বিশেষ। এক কারাগার হইতে অন্য কারাগারে যাওয়া, এক কক্ষ হইতে অন্য কক্ষে যাওয়া মাত্র,—তাঁহাতে বিচলিত হইবার কিছুই নাই। ঠিক এই সময় হইতে তাঁহাকে কিছুকাল নির্জন কারাবাস ভোগ করিতে হয়।

সাধারণ কারাবাস অপেক্ষা—নির্জন কারাবাস যে বহুগুণে কষ্টকর সমাজের মানুষকে আর তাহা বলিয়া দিতে হয় না। প্রথম প্রথম বুদ্ধদেবের অসহ্য কষ্ট হইয়াছিল। বাহিরের কদাচিৎ পাখীর ডাক, কুকুরাদির গীৎকার, এমন কি প্রহরীর রুঢ় পদধ্বনি তাঁহাকে কথঞ্চিৎ শান্তি দিত। সতর্ক কর্তৃপক্ষ যেন তাহাও বুঝিয়া লইল। তাহার পর হইতে যেন পাখী উড়িয়া গেল, কুকুর স্তব্ধ হইল, প্রহরীর শব্দবিহীন পদক্ষেপে চলিতে লাগিল।

এই সব পরিচিত শব্দ অভাবে বুদ্ধদেব কিছুকাল যেন পাগলের মত হইলেন। ক্রমশঃ তিনি অশান্ত আত্মাকে শান্ত করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি ঈশ্বর চিন্তায় মন দিলেন।

কোন দিক্ দিয়া চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইবার কোন আশঙ্কা নাই ;— বুদ্ধদেবের স্বদেশান্ত প্রাণ ঈশ্বরে সমর্পিত হইল। বণ্টার পর বণ্টা তিনি ঈশ্বর চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকিতে লাগিলেন। প্রহরীর দেওয়া খাবার কত দিন তিনি স্পর্শও করিতেন না ; তাহার জন্ম কোন অভাবও অনুভূত হইত না। নির্জন কারাবাসেও তাঁহার আর কোন কষ্ট রহিল না। তখন আবার তাঁহাকে নির্জন কারাবাস হইতে মুক্তি দিয়া সাধারণ কারাগারের অন্তর্গত করিয়া লওয়া হইল।

এইরূপে আরও কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। নির্জন কারাবাসের বিশেষত্ব এখানেও তিনি বজায় রাখিলেন। কর্তৃপক্ষ তখন তাঁহার উপর আর রুদ্ৰদৃষ্টি রাখিতে চাহিলেন না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি যদি গর্ভর্নমেণ্টের বিপক্ষে আর যোগ না দেন—তাহা হইলে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।

বুদ্ধদেব বলিলেন, তিনি চিরদিন স্বদেশের সেবা করিয়াছেন—তবু তাঁহাকে এত দীর্ঘকাল বন্দী থাকিতে হইয়াছে। স্বদেশের মঙ্গল ও

গভর্ণমেণ্টের অমঙ্গল যদি একই পথে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা হইলে তিনি নিরুপায়।

আরও কিছুদিন কাটিয়া গেল। বুদ্ধদেব হঠাৎ একদিন কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কেন যে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইল, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না।

২৬

অসাধারণ মনের জোরে গৌরান্দের মাতা জাহ্নবী এতদিন এত দুঃখ ও কষ্ট সহ করিয়া সংসার করিয়াছিলেন। স্বামী আসার পর হইতে তাঁহার আর কোন দুঃখ রহিল না। মাতৃ-অন্ত-প্রাণ পুত্র, সেবাপরায়ণ পুত্রবধু—ও দেবতার মত স্বামী সবই তিনি পাইলেন। কিন্তু এই সময় হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

একমাসের মধ্যে জাহ্নবী শয্যা গ্রহণ করিলেন। গৌরান্দ চিকিৎসক ডাকিয়া আনিল। চিকিৎসক বলিলেন, ইহা কঠিন হৃদরোগ—সারিবাহ্য নহে। স্বল্প উত্তেজনায় যে কোন সময়ে মৃত্যু হইতে পারে। যাহাতে মনে কোন দুঃখ, কোন উদ্বেগ—না আসে তাহাই করা প্রয়োজন।

কিন্তু জাহ্নবীদেবীর উদ্বেগের অবসান কেমন করিয়া হইবে? শেষ জীবনে যে তিনি স্বামীকে ফিরিয়া পাইবেন, এ ভরসা তাঁহার ছিলনা তাই স্বামীকে ফিরিয়া পাইয়াও কখন কি হয় এই ছিল তাঁহার ভাবনা এজন্য দুঃখের অবসানেও তাহার উদ্বেগের নিবৃত্তি হইল না।

বুদ্ধদেব কোন রাজনৈতিক সভাসমিতিতে যোগ দিতেন না ধর্মগ্রন্থ পাঠ—দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা, উক্ত বিষয়ে প্রবন্ধাদি লেখা—এই ছিল তাঁহার কাজ।

তিনি জাহ্নবীকে ভরসা দিতেন, তুমি নিশ্চিত হও, আর আমার কোন ভয় আমার নাই। কেন তুমি এত ভাব ?

তবুও জাহ্নবীর ভাবনা কমিত না।

এই ভাবে ছয় মাস কাটিয়া গেল।

একদিন অপরাহ্নে গৌরাজ্ঞ মায়ের চরণ বন্দনা করিয়া কহিল, মা আমি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছি, বোধ হয় বৃত্তিও পাব, মণিও প্রথম বিভাগে পাশ হয়েছে।

মায়ের মুখে আনন্দের জ্যোতিঃ কুটিয়া উঠিল। পুত্রের মাথায় হাত দিয়া তিনি আশীর্বাদ করিলেন।

একটু পরে ভাবনার মেঘে আবার তাহা ঢাকিয়া গেল।

শান্তি শাশুড়ীর পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—মা আপনি এত দুর্বল কি করে হয়ে গেলেন ? আপনার সে শক্তি—সে সাহস কোথায় গেল মা ?

জাহ্নবী হাসিয়া বলিলেন—উনি এসেছেন, এখন সব ভার ঔঁর। আর আমার শক্তির কি দরকার মা ?

শান্তি বলিল—আপনাকে আবার শক্ত হতে হবে মা ! আপনি কেন এত ভাবেন মা ? আর তো কোন ভয় নেই।

ভাল থাকিলে জাহ্নবী একটু আধটু যুরিয়া বেড়াইতেন, কাজ করিতে চাহিতেন। কিন্তু শান্তির সতর্ক দৃষ্টির কাছে পরাজিত হইতেন। হাসিয়া বলিতেন—মা তোমার কি চারদিকে চক্ষু।

সুশীলাসুন্দরী দেখিতে আসিলে জাহ্নবী দেবী বলেন—“দিদি, তোমার কাছে আমি চিরধনী রইলাম। তুমি আমাকে অমূল্য রত্ন দিবেছ, আর আমার কোন দুঃখ নেই।”

তবে কেন সে উঠতে পারেনা দিদি ?

সুশীলাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করেন ।

জাহ্নবী বলেন—তোমার কাছে আমি গোপন করবনা দিদি । আমার কেবলি ভয় হয়, পাছে আবার কোথা থেকে কোন্‌ দুঃখ বৃষ্টি বা আসে, আবার বৃষ্টি বা কাউকে নিয়ে যায় ।

বলিতে বলিতে জাহ্নবীদেবীর মুখখানি ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায় ।

সুশীলাসুন্দরী তাঁহার গারে মাথায় হাত বুলাইয়া বলেন, “অনর্থক এমন ভয় কোরোনা দিদি ।”

জাহ্নবী একদিন মাসিক পত্র পড়িতেছিলেন, তাহাতে এক স্বদেশ সেবকের কারাকাহিনী ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতেছিল । প্রকাশিত অংশে ছয় মাসের মধ্যে তাঁহাকে ১০টি বিভিন্ন কারাগারে প্রেরিত করা হইয়াছিল । দুঃখের মাঝে মানুষ ধীরে ধীরে মন স্থির করিয়া লয় ; ইহাতে কিন্তু সময়ের প্রয়োজন হয় । এক স্থানে এক সঙ্গে কিছুকাল থাকিতে পাইলে তবে মানুষ মনের সঙ্গে একটা বোঝা পড়া করিয়া লইতে পারে । একে তো কারাগার, যেখানে মানুষের কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই—তাহার উপর অনবরত স্থান, কক্ষ ও প্রহরীর অনবরত পরিবর্তন । কয়েকটা দুঃখ সহিয়া লইয়া জীবনকে সহন যোগ্য করিয়া লইতে না লইতে আবার একটি পরিবর্তনের ঢেউ আসিয়া সকল ব্যবস্থা উল্টু পাল্টু করিয়া দিল । ইহার যে কি দুঃখ, কি অশান্তি তাহা যেন বর্ণনার ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে ।

সে বর্ণনা পড়িতে পড়িতে জাহ্নবীর চোখ দু'টি বার বার জলে ভরিয়া আসিতে লাগিল । তাঁহার কেবলি মনে হইতে লাগিল, কি দারুণ কষ্টে তাঁহার স্বামীর জীবন অতি দীর্ঘকাল কাটিয়াছে ; কি অপরিমেয় সহিষ্ণুতার সহিত তিনি এ সমস্ত সহ্য করিয়াছেন । আসিয়া পর্য্যন্ত কৈ এ সম্বন্ধে কোন একটা কথাও ত তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হয়

নাই। লোকে আপনার সম্বন্ধে তুচ্ছ কথাও বড় করিয়া বলে ; আর ইঁহার, আপনার সম্বন্ধে বড় কথাও তাঁহার কাছে অতি তুচ্ছ।

বেশীক্ষণ আর সে কাহিনী পড়া হইল না। বুক কেমন একটা বেদনা বাজিতে লাগিল। বই রাখিয়া বুকটা চাপিয়া জাহ্নবী কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন। মন কিন্তু তাঁহার আৰ্ত্তনাদ করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। কোথায় কোন কারাক্ষের কঠিন প্রস্তর শয্যার উপর যেখানে তাঁহার স্বামীর পবিত্র মহৎ জীবন অপরিসীম কষ্টে অতিবাহিত হইয়াছে।

অনেকক্ষণ বিশ্রামের পর জাহ্নবী অনেকটা স্তব্ধ হইলেন।

দ্বিপ্রহরে আহাৰাদির পর জাহ্নবী স্বামীকে বলিলেন—“কত কষ্টে তোমার দিন কেটেছে তার একটা কথাও তো তুমি আমাকে বললে না!”

বুদ্ধদেব। তার চেয়ে ঢের বেশী কষ্ট যে তুমি পেয়েছ জাহ্নবী ; কাজেই সে সব কথা তোমার কাছে কোন্ মুখে বলব বল ?

জাহ্নবী। আমি আর তোমার ও কথায় ভুল্ছিনে। আমি ছেলে নিয়ে তবু স্বাধীন ভাবে ছিলাম, দিনান্তে ইচ্ছামত দু'টো মুখে দিচ্ছিলাম, গৌরান্দের মুখে মা বুলিও শুন্ছিলাম। আর তুমি—?

বুদ্ধদেব। কি গভীর দুঃখ ও দায়িত্বের মধ্যে যে তোমাকে ফেলে গিয়েছিলাম—তা আমিই জানি। তুমি ছাড়া খুব কম নারীই এ অবস্থায় তোমার মত কর্তব্য করে যেতে পারত। গৌরান্দ্র যে আজ এমন হয়েছে, সে তো তোমারি কাজ ; অথচ আমার চেয়েও নিরানন্দে তোমার দিন কেটেছে।

জাহ্নবী। কষ্ট তুমি বেশী পেয়েছ কি আমি বেশী পেয়েছি—এনিয়ৈ তোমার সঙ্গে আমি আর তর্ক করব না। কিন্তু আমি তোমার কারাবাসের কথা না শুনে ছাড়ব না।

বুদ্ধদেব। আচ্ছা, তুমি তাই শুনো। আর একটু সেরে ওঠো

তারপর আমি সবিস্তারে তোমাকে সব কথা বোলবো। তোমার কোন ক্ষোভ রাখব না।

জাহ্নবী। আজ আমি আর এর চেয়ে জিদ কোরবো না ; কিন্তু ভুলে যেওনা যেন।

বুদ্ধদেব। না ভুলব না। কিন্তু তোমার আজ এসব কথা কেন মনে হ'ল ?

জাহ্নবী। মনে একথা আমার অনেকদিন থেকেই হচ্ছে ; বলি বলি করে এতদিন বলা হয়নি। আজ একখানা মাসিকে কারা-কাহিনী প'ড়ে একথা জান্‌বার জন্ম বড় আগ্রহ হয়েছে।

বুদ্ধদেব। তোমার অসুস্থ শরীরে এসব লেখা এখন পোড়োনা।

জাহ্নবী। তোমরা হাসালে দেখছি। একটা মেয়ে মানুষের শরীরের জন্ম অত কেন গা ! তুমি বল্‌চো পোড়োনা, বোমা বল্‌চেন—মা উঠোনা, গৌরাজ বল্‌চে মা কথা কোয়োনা।

বুদ্ধদেব। তোমার প্রাণ যখন আমাদের সকলের কাছে এত মূল্যবান, তখন আমাদের পানে চেয়ে তোমার শরীরে দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত !

জাহ্নবী। তা তোমাদের সব কথাই তো শুনছি ; আর কি কোরবো বল।

এমন সময় শান্তি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া শাশুড়ীর পায়ের কাছে বসিল। শ্বশুর মাথার কাছে বসিয়াছিলেন।

জাহ্নবী বলিলেন—একটু শুলে না কেন মা ? সেই সকাল থেকে উঠে সমানই খাটছ।

শান্তি বলিল—দিনে শুতে ইচ্ছে করে না মা। রাত্তিরে তো শীঘ্রই কাজ সারা হয়ে যায় ; ঘুমের কিছুই অভাব হয়না তো মা।

জাহ্নবী স্বামীকে বলিলেন—বিবাহ দেবার সময় আমার এক একবার ভয় হ'ত যদি তোমার অপছন্দ হয়।

বুদ্ধদেব। একথা কেন তোমার মনে হ'ত? তোমার মতে আমি তো কখন অমত করিনি।

জাহ্নবী। তা নয়; একটু ভয় হ'ত যদি তুমি মনে কর আমাদের এ অস্থায় বড়লোকের ঘরের মেয়ে কেন আনা? আমার মাকে দেখে কে বলবে যে, আমাদের ঘরে মাকে মানায় না!

বুদ্ধদেব। মা আমার সত্যকার বড় লোকের মেয়ে; সে জন্ম মাকে এ ঘরেও শোভা পেয়েছে। মা অন্নপূর্ণাকে ভিখারী শিবের ঘরেই বেশী মানিয়ে ছিল।

শান্তি লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া শাশুড়ীকে বাতাস করিতে লাগিল।

কিছু পরে গৌরান্দ্র কলেজ হইতে ফিরিল। মায়ের পায়ে কাছ শান্তির পাশে বসিয়া মায়ের পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—“আজ কেমন আছ মা?”

জাহ্নবী বলিলেন—ভাল আছি, বাবা। আগে হাত মুখ ধুয়ে জল খেয়ে আয়—তারপর বসিস্।

‘আচ্ছা, যাচ্ছি মা,’ বলিয়া—গৌরান্দ্র মায়ের পায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল।

জাহ্নবী আবার একবার বলিতে গৌরান্দ্র উঠিল। শান্তির দিকে গিয়া জাহ্নবী বলিলেন—“বৌমা, তুমিও এখন একটু উঠে নাও।”

গৌরান্দ্র তখনও ছয়ার পার হয় নাই। সে মুখ ফিরাইয়া বলিল, কোথায় খাবার থাকে আমি জানি তো মা, আমি নিজেই নিয়ে যাচ্ছি।

গৌরান্দ্র পুস্তকাদি রাখিয়া কলতলায় গেল, জলের শব্দে জাহ্নবী তাহা বুঝিলেন। ঘরের শিকল খোলার শব্দে তিনি বুঝিলেন, গৌরান্দ্র এবার

থাইতে বসিবে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে পড়িল, চালের জালায় যে পেন্‌পেটা রাখা হইয়াছে সেটা বোধ হয় পাকিয়াছে। পেন্‌পেটা ভাল পাকে নাই বলিয়া তিনি শান্তিকে চাউলের মধ্যে রাখিতে বলিয়াছিলেন।

জাহ্নবী ভিজ্জাসা করিলেন—“পেন্‌পেটা পেকেছে কিনা, বৌমা, দেখেছ কি?” শান্তি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে দেখে নাই।

জাহ্নবী একটু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, তবে যাওনা মা ; যদি পেকে থাকে আধখানা কেটে তাকে দিয়ে এস ; পেন্‌পে সে বড় ভালবাসে।

শান্তি শাস্ত্রীর সেবা ছাড়িয়া উঠিবে কিনা ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া বুদ্ধদেব বলিলেন, “তুমি যাও মা, গৌরান্দের ‘জলখাওয়া’ হলে দু’জনে এস—আমি ততক্ষণ এঁর কাছে বসছি।”

শান্তি উঠিয়া গেল।

বুদ্ধদেব জাহ্নবীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, “বৌমাটি সাক্ষাৎ লক্ষী।”

জাহ্নবী বলিলেন, ‘সত্যিই তাই’।

হঠাৎ বাহিরের দুয়ারে কড়া নাড়িয়া কে ডাকিল—“বাড়ী আছেন?”

‘আমি চট করে দেখে আসি কে’ বলিয়া বুদ্ধদেব উঠিয়া গেলেন।

জাহ্নবীর মনটা যেন হঠাৎ ছাঁৎ করিয়া উঠিল, খানিক সময় গেল, বুদ্ধদেব ফিরিলেন না। জাহ্নবী কেমন যেন ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন ; পায়ে পায়ে আগাইয়া ধীরে ধীরে গৌরান্দের পড়িবার ঘরে আসিলেন। মাঝখানের দুয়ারটা ভেজানো—পরের ঘরটিতে স্বামী কাহাদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

গৌরান্দের চেয়ারের উপর বসিয়া জাহ্নবী উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেন লাগিলেন।

বুদ্ধদেব। এর কারণ কি ?

আগন্তুক। আমরা তা জানিনে। গভর্নমেন্টের আদেশ আপনাকে দেখালাম। সমুদ্রের ধারে আপনি থাকবেন, বেশ স্বাস্থ্যকর স্থান, আপনার স্বাধীনতায় কেউ হস্তক্ষেপ করবে না। কেবল সেখান থেকে আসতে পারবেন না, এই পর্য্যন্ত।

বুদ্ধদেব। অশেষ ধন্যবাদ। অনেকখানি স্বাধীনতাই দেবেন আপনারা। যদি এই গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্য ছিল, আমাকে মুক্তি না দিলেই হ'ত।

আগন্তুক। বিচারের ভার আমাদের উপর নেই, আছে শুধু কাজের ভার।

বুদ্ধদেব। কত কাল থাকতে হবে আমাকে সেখানে ?

আগন্তুক। ঠিক বলতে পারিনে আপনি বাংলা দেশে আসতে পারবেন না এই পর্য্যন্ত জানি।

বুদ্ধদেব। আর একটা কথা। আমার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যেতে পারি কি ? তিনি অত্যন্ত অসুস্থ।

আগন্তুক। মাপ করবেন। সেখানে আপনার একা থাকাই ব্যবস্থা হয়েছে। চাকর পাচক সব আপনি পাবেন।

জাহুবীর আর শুনবার ক্ষমতা হইল না। তিনি বিস্ফারিত নেত্রে দুয়ারের দিকে একবার চাহিলেন। তাঁহার বক্ষঃস্পন্দন বারকয়েক দ্রুত হইয়া হঠাৎ একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। চেয়ারের উপর হেলান দিয়া যেমন বসিয়া ছিলেন তেমনই রহিলেন।

বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, আমি একবার বাড়ীর ভিতর যেতে পারি ?

আগন্তুক বলিলেন, যাবেন, কিন্তু দয়া করে শীঘ্র ফিরবেন।

বুদ্ধদেব উঠিলেন। দুয়ার খুলিতেই জাহুবীকে দেখিলেন। দুয়ার বন্ধ করিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, ‘তুমি তাহলে সব শুনেছ?’

উত্তর নাই। বুদ্ধদেবের মন কাঁপিয়া উঠিল। তবে কি—?

অত্যন্ত উদ্বেগ চিত্তে বুদ্ধদেব জাহুবীর গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, বক্ষ: পরীক্ষা করিলেন, নাড়ী দেখিলেন। বুঝিলেন সব শেষ হইয়া গিয়াছে।

কিছুক্ষণ স্থির ভাবে বুদ্ধদেব স্তম্ভমুতা স্বাধ্বী-পত্নীর মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। আত স্নেহভরে একবার তাঁহার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া অক্ষুট স্বরে বলিলেন, আগেই চলে গেলে!

২৭

বুদ্ধদেব ধীর পদক্ষেপে আবার সেই ঘরে আসিলেন। পুলিশ কর্ম-চারীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আমার স্ত্রী এইমাত্র হার্টফেল করে মারা গেছেন; তাঁর শেষ কাজ করার অনুমতি পাব কি?”

অনুমতি মিলল। ডাক্তারকে একবার দেখান উচিত তাই ডাকা হইল। তিনিও মৃত্যুর ঐ একই কারণ নির্দেশ করিলেন।

গৌরাজ সজল নেত্রে মায়ের পানে চাহিয়া রহিল। শান্তি ‘মা’ ‘মা’ করিয়া শাশুড়ীর পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল।

সুরেশ বাবুর কাছে সংবাদ গেল। তাঁহারা তৎক্ষণাতঃ সপরিবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাহারো চক্ষু শুষ্ক রহিল না।

সুশীলাসুন্দরী কাঁদিয়া কহিলেন, দিদি, “তোমার মত ভাগ্য যেন আমারও হয়। আমিও যেন এমনি সব রেখে যেতে পারি।”

সেই অবস্থায় জাহুবীর একখানি ফটো লওয়া হইল। অবিলম্বে

অন্ত্যষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা হইয়া গেল। যে এই অপরূপ মৃত্যুর কথা শুনি, সেই শ্রদ্ধাঘিত হৃদয়ে বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। জাহুবীর দেহ পাটের উপর রাখিয়া পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করা হইল। তারপর গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া তাঁহার শেষ-কৃত্য করিয়া সকলে ফিরিল।

বুদ্ধদেব খুব সংক্ষেপে সুরেশ বাবুকে বলিলেন, “দুয়ারে আমার সারথি দাঁড়িয়ে, এখনি রথে উঠতেই হবে। আর কি বলব? ভয় ছিল যার জন্ম—তিনি নির্ভাবনায় দেশে চলে গিয়েছেন। সেজন্য আর উদ্বেগ নাই।”

সুরেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় আপনাকে রাখবে সে কথা বলেছে?

বুদ্ধদেব বলিলেন, ‘না, শুধু বলেছে সমুদ্রের ধারে এই পর্য্যন্ত। যেখানেই রাখুক তার জন্ম আমার আর কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। জাহুবী আমাকে যে পাথের দিয়ে গেছেন, ভগবানের পায়ে তাই সমর্পণ করে আমি পরপারে যাবার অধিকার অর্জন করে নেব।

গৌরান্দকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, গৌরান্দ, তোমাকে আমি কোন দিন শিক্ষা দিতে পারিনি; কিন্তু তুমি যার কাছে শিক্ষা পেয়েছ, তিনি আমার চেয়েও ঢের বড়। তোমার শিক্ষা সফল হবেই। আমি শুধু তোমাকে একটা কথা বলে যাই—বিত্ত ও বিদ্যা আগে অর্জন করবে, তারপর সব দেশের সেবায় নিয়োগ করবে—এক কথায় দেশের জন্ম সব ত্যাগ করবে। তোমার দেশবাসীর হৃদয়ে ত্যাগের মূল্য স্থায়ী না হলেও ক্ষোভ কোরোনা। সে তো এক দিনের কাজ নয়। শত সহস্র ত্যাগের মহিমানিক্যে দেশমাতার সিংহাসন গড়ে উঠবে। বহু সহস্রের ত্যাগের মহিমায় যখন সবারি হৃদয়ে ভক্তি ও শক্তি জেগে উঠবে—সেই হবে সিংহাসনের বল। আয়োজনকে কাজের সমাপ্তি ভেবে হতাশ হোয়ো না।

শান্তিকে ডাকিয়া বুদ্ধদেব বলিলেন, মা, তোমাকে তো কিছুই বলবার নেই। তোমাকে আমি চিনেছি। আমার একমাত্র ক্ষোভ এই তোমাকে আর কিছু দিন দেখে যেতে পারলাম না। তুমি যে গোরাক্ষের সব সংকার্যে সহায় হবে, তা তোমাকে দেখেই আমি বুঝেছি।

তখন সন্ধ্যা আসন্ন। কার্য শেষ করিয়া বুদ্ধদেব বাহিরে আসিয়া পুলিশ কর্মচারীদের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। পুলিশকর্মচারীরা তাঁহাকে গাড়ীতে উঠাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। কারামুক্ত বুদ্ধদেব এক বৎসরের মধ্যেই নিরুদ্দেশ যাত্রা করিলেন।

গোরাক্ষ একই দিনে পিতামাতা দু'জনকেই হারাইল।

২৮

সে রাতে সুরেশচন্দ্র, স্মৃশীলাসুন্দরী ও মণীন্দ্র গোরাক্ষের কাছে রহিলেন। আর সকলে বাসায় ফিরিল। পরদিন সুরেশবাবু চলিয়া আসিলেন মায়ের সঙ্গে মণীন্দ্র কিছুদিন রহিয়া গেল।

শ্রদ্ধ মিটিয়া গেল। স্মৃশীলাসুন্দরী একদিন গোরাক্ষকে বলিলেন, “এখন দিন কতক ও বাড়ীতে গিয়ে থাকলে ভাল হয়।”

গোরাক্ষ বাবল, মা এখানে ছিলেন। কত বছর তাঁর সঙ্গে এই বাড়ীতে কাটিয়েছি। এ বাড়ী ছেড়ে গেলে যেন মাকে ছেড়ে যাচ্ছি বলে মনে হয়। কিন্তু আপনি আর কতদিন এখানে থাকবেন; ওঁদের সব কষ্ট হচ্ছে। আপনি বরং যান। মাঝে মাঝে আমি গিয়ে আপনাকে নিয়ে আসব। এখন তো আপনি ছাড়া আর কেউ রইল না।

স্মৃশীলাসুন্দরী ধীরে ধীরে সাস্বনা দিতে লাগিলেন। বলিলেন, “তোমার পিতামাতা দেবতা ছিলেন। তাঁদের জন্ত ক্ষোভ করতে নাই। মা

বেঁচে থাকলে আবার তো সেই আগেকার মত কষ্ট পাইতেন।
তাঁহার মত সতীলক্ষ্মী কয়জন থাকে? তাঁহার জন্ম দুঃখ করিতে নাই।

মা তাঁহাকে কত দুঃখ কষ্টে মানুষ করিয়াছেন তাহার জন্ম কত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, কত ভাল তাহাকে বাসিতেন, সে সব কথা সজল নয়নে বলিল। মায়ের ছবিখানি পিতার ছবির পাশে রাখিয়া দিল। পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সহিত পিতামাতার পূজা করিতে লাগিল।

গোরাঙ্গকে একটু শান্ত করিয়া সুশীলাসুন্দরী বাসায় ফিরিয়া গেলেন। তিনি সপ্তাহে দুইদিন আসিয়া কত্কা জামাতার সন্ধান লইতে লাগিলেন! গোরাঙ্গ একাগ্রচিত্তে বিদ্যা অর্জন করিতে মন দিল। সে যেন অধ্যয়নের তপস্বী। কলেজের পাঠ সারিয়া সে প্রতিদিন সাহিত্য ও ইতিহাসের পুস্তকাদি পড়িয়া নিয়ম ও আয়াস সহকারে জ্ঞানের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

জ্ঞান-পিপাসা, ভাষা জ্ঞান, গভীর অধ্যয়ন ও মধুর স্বভাবের জন্ম গোরাঙ্গ কলেজের অধ্যাপকদিকের অতি প্রিয় পাত্র হইয়াছিল। কলেজের যাবতীয় অনুষ্ঠানের সহিত সে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট রহিল। কলেজের ডিবেটিং সোসাইটির সে সেক্রেটারী, কলেজ ম্যাগাজিনের সে সম্পাদক ও শ্রেষ্ঠ লেখক, সেবাসমিতির সে সভাপতি।

এই সমস্ত অনুষ্ঠানের সহিত এত ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত থাকিলেও তাহার অধ্যয়নের অনুরাগ সমভাবেই ছিল। এত বিষয়ের নেতৃপদ পাইয়াও তাহাকে নিরতিশয় শান্ত ও সংযত দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইত।

ক্রমে পরীক্ষা আসিল। গোরাঙ্গ ও মণীন্দ্র পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইল। গোরাঙ্গ সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করিল।

মা নাই, বাবা বহু দূরে—আনন্দ সংবাদ বহন করিয়াও ম্লানমুখে গোরাঙ্গ কুটীরের দুয়ারে পৌঁছিল।

ভিতরে আসিতেই শান্তি স্বামীর মুখপানে চাহিয়া বলিল—“তোমাকে আজ এত কাতর দেখাচ্ছে কেন?”

গৌরাঙ্গ বলিল—পরীক্ষায় আমি আজ প্রথম হয়েছি ;—কিন্তু মাকে আজ কোথায় পাব যে এ খবর দিয়ে মায়ের মুখে হাসি দেখব।

গৌরাঙ্গের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। শান্তিও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলনা।

একটু পরে শান্তি উঠিয়া ক্ষিপ্রহস্তে রক্তন শেষ করিয়া স্বামীর কাছে আসিল।

গৌরাঙ্গ বলিল—বাবা বাবার দিন বলে গেছেন আগে কিছু অর্জন করে, পরে দেশের জন্ত তা ত্যাগ করবে। চাকরিতে অর্থ অল্প, আইন ব্যবসা করাই আমার ইচ্ছা। তোমার যদি আপত্তি না থাকে আমি ব্যারিষ্টারি পড়ার জন্ত বিলাত যেতে যাই।

শান্তি ধীরে ধীরে বলিল, তোমার যাতে উন্নতি হবে, আমি তাতে অমত কেন করব ?

গৌরাঙ্গ বলিল, সুধু যে ব্যারিষ্টারি পড়ার জন্তই বিলাত যেতে চাইছি তা নয় ;—স্বাধীনতা জিনিসটা আমরা জানিনে। স্বাধীন দেশ না দেখলে স্বাধীনতার ধারণা পর্য্যন্ত ঠিক হয়না। আমরা চিরকাল বন্ধই আছি, মুক্তি কাকে বলে জানিনা। একবার অন্ততঃ মুক্তির মূর্তি দেখে আসব।

আহাৰাদির পর সেই-রাত্রেই গৌরাঙ্গ শান্তিকে লইয়া শ্বশুর বাড়ীতে গেল। ব্যারিষ্টারি পড়বার সংকল্পও সেখানে প্রকাশ করিল। কেহই এ প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন না। মাসখানেক পরে বৃত্তিলাভ করিয়া গৌরাঙ্গ বিলাতযাত্রা করিল।

শান্তি পিত্রালয়ে রহিল।

গভীর রাত্রে সুশীলাসুন্দরী দুঃস্বপ্ন দেখিয়া হাসিয়া উঠিলেন। স্বপ্নে কতক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়াছেন তাহার ঠিক নাই; এখনও দু'টি চক্ষে অশ্রুধারা প্রবাহিত।

স্বামীকে জানাইয়া সুশীলাসুন্দরী বলিলেন—“আজ পর্য্যন্ত আমার কোন সাধ তুমি অপূর্ণ রাখনি। আজ আমার মনে শেষ সাধ উদয় হয়েছে। এটিও তুমি পূর্ণ করে দাও!”

সুরেশ। কি সাধ বল? তোমার গলার স্বর ভারী কেন, চোখে জল কেন?

সুশীলা। একটা স্বপ্ন দেখেছি।

সুরেশ। দুঃস্বপ্ন?

সুশীলা। ঠিক দুঃস্বপ্ন বলা যায়না; বরং সুস্বপ্নই—তবু মনে কষ্ট হয়েছে।

সুরেশ। কি স্বপ্ন?

সুশীলা। স্বপ্ন দেখেছি—আমি মৃত্যু শয্যায়। তুমি আমার শিরেরে বসে। শান্তি, ইন্দু, বোমা পাসে বসে কাঁদছে, ফণী আর খোকা আমায় কেবল ডাকছে, কিন্তু আমি উত্তর দিতে পারছি না; মণী আর ফণী পায়ে কাছে দাঁড়িয়ে। তোমাদের সবাইকে রেখে যেতে পারছি মনে করে আমার আনন্দই হচ্ছিল; কিন্তু মণীর মুখের পানে চেয়ে মনে হ'ল, তার মুখখানি বড় স্নান। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল মণীর বোঁকে তো আমি দেখে যেতে পারলাম না। মণীর বোঁ দেখে গেলে আমার আর কোন দুঃখ

থাকবে না। শীগ্গির মণীর একটি বো এনে দেও। দেবী করলে আমার অদৃষ্টে তাকে আর দেখা হবেনা।

সুরেশ। তাই হবে। এ আর বেশী কথা কি? ভেবেছিলাম লেখাপড়া শেষ করিয়ে বিয়ে দেব;—তা তোমার যখন ইচ্ছা তখন দেবী করব না।

সুশীলা। তা হলে আমার জীবনের কোন সাধ অপূর্ণ থাকবেনা।

সুরেশ। মণীর কাজকর্মের একটা ব্যবস্থা করতে পারলেই আমরা দু'জনে কিছুদিন তীর্থভ্রমণে বা'র হব।

সুশীলা। আমার মনে নিচ্ছে আমি আর বেশীদিন বাঁচবনা। তা হোক, তাতে আমার কোন ক্ষোভ নেই। তোমার সঙ্গেই আমি চিরদিন তীর্থ মনে করে এসেছি—আজও তাই মনে করি। অন্য তীর্থে আমার লোভ নেই।

ইহার পর দু'জনের কাহারও চক্ষে আর নিদ্রা আসিলনা। ঐ প্রসঙ্গের কথাবার্তা কহিতে কহিতে রাত্রি প্রভাত হইল।

প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া সুরেশবাবু আফিসে বসিয়া কাজ করিতেছেন এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, দু'টি বাবু দেখা করিতে আসিয়াছেন। একটি সুসজ্জিত ঘরে তাঁহাদের বসানো হইল। একটু পরেই সুরেশবাবু আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন।

ভদ্রলোক দুইজন মণীন্দ্রের বিবাহের প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে একজন কন্ঠার পিতা—নাম গণেশ মুখোপাধ্যায়। পূর্বে ওকালতী করিতেন, এক্ষণে বিস্তীর্ণ জমীদারী লাভ করিয়া ওকালতী ছাড়িয়া দিয়াছেন। জমীদারী ২৪ পরগণা ও যশোহরের নানাস্থানে বিস্তৃত; উপস্থিত কলিকাতেই বাস করেন। অপর ভদ্রলোকটি তাঁহার বন্ধু।

পরস্পর বংশ পরিচয়াদি হইল।

সুরেশবাবু। বিবাহ আর একটু দেরীতেই দেবার ইচ্ছা ছিল ; কিন্তু আমার স্ত্রীর ইচ্ছাতে সে সংকল্পের পরিবর্তন করেছি। মেয়েটির বয়স কত ?

গণেশবাবু। ১৩।১৪ বৎসর হবে।

সুরেশ। মণীন্দ্রকে আপনারা একবার দেখে যান্। তারপর আমি বা আমার স্ত্রী গিয়ে মেয়েটিকে দেখে আসিব।

গণেশ। ছেলেটিকে আমরা ভাল করেই দেখেছি। ইন্টিউটে এ একদিন আর গোলদীঘিতে একটি সভায় একদিন আপনার ছেলেকে গান গাইতে শুনেছিলাম। সে গান শুন্বার মত বটে।

সুরেশ। হাঁ, মণী বড় মধুর গায়। তবু একবার দেখা ভাল।

এমন সময় আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ের গাড়ী দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ইন্দু পুস্তকাদি লইয়া গাড়ী হইতে নামিল। এই বিদ্যালয় প্রায় শীতকাল ব্যতীত সব সময়েই সকালে বসে। আজ শনিবার ৮টার ছুটি হইয়াছে।

সুরেশবাবু ইন্দুকে ডাকিয়া বলিলেন, মণীকে একবার এখানে পাঠিয়ে দিওতো মা।

গণেশবাবু ইন্দুর দিকে একবার বিস্মিতভাবে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—
—আপনার তো একটি মেয়ে—এ মেয়েটি কে ?

সুরেশবাবু হাসিয়া বলিলেন—এটি আমার মা।

ইন্দু মূহ হাসিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

একটু পরেই মণীন্দ্র আসিয়া বলিল, কি বলছেন বাবা ?

সুরেশবাবু। তুমি কি করছিলে ?

মণীন্দ্র। আপনি সেদিন বলেছিলেন, Hero and Hero Worshih অনুবাদ করতে—তাই একটু করছিলাম।

সুরেশ । কতখানি হয়েছে ?

মণীন্দ্র । অর্ধেক হবে ।

সুরেশ । কি রকম লাগছে ?

মণীন্দ্র । বেশ ভাল । তবে সময়ে সময়ে মনে হচ্ছে, মূল লেখার শক্তি অনুবাদে রাখতে পাচ্ছি না ।

সুরেশ । লেখকের পক্ষে এটা শুভলক্ষণ ।

মণীন্দ্র । কেন বাবা ?

সুরেশ । কারণ তার দ্বারা বোঝা যায়, লেখকের আদর্শ আরো উচ্চে । হ্যাঁ, আপাততঃ তোমাকে ডেকেছি এঁদের সঙ্গে দেখা করতে । এঁরা তোমার গানের সুখ্যাতি করছিলেন । এঁদের প্রণাম কর ।

মণীন্দ্র তাঁহাদের প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ।

সুরেশবাবু বলিলেন, এবার তুমি যেতে পার ।

মণীন্দ্র আপনার কাজে ফিরিয়া গেল ।

দুইজনই বলিলেন—সুন্দর ছেলে আপনার, যেমন রূপে তেমনি গুণে । আমাদের মেয়েটি দয়া কবে নিন্—অবশ্য যদি অপচন্দ না হয় ।

সুরেশবাবু বলিলেন—আমারও আর কোন আপত্তি নেই এখন প্রজ্ঞা-প্রতির নির্বন্ধ । আমরা যে কেউ ৫টা থেকে ৬টার মধ্যে যাব ।

তাঁহারা ঠিকানা দিয়া উঠিয়া গেলেন ।

সুরেশবাবু উঠিয়া অস্ত্রপুরে প্রবেশ করিলেন ।

সুশীলাসুন্দরীকে ডাকিয়া বলিলেন—তোমার ইচ্ছাশক্তি অসামান্য আজ সকালেই মণীর বিবাহের সম্বন্ধ এসেছে । এই তাঁদের সঙ্গে কথা কয়ে আসছি । বালিগঞ্জে তাঁদের বাড়ী । আমি বলে এসেছি—হয় তুমি না হয় আমি ৫টা সাড়ে ৫টায় গিয়ে দেখে আসব ।

সুশীলাসুন্দরীর মুখমণ্ডল হর্ষে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল । দুই হাত ষোড়

করিয়া তিনি বলিলেন—“মায়ের দয়া ; তা নইলে সঙ্গে সঙ্গে কি আজই এ প্রস্তাব আসে । দেখো, এই মেয়ে নিশ্চয়ই তোমার পছন্দ হবে ।”

সুরেশ । তাহলে তুমিই গিয়ে দেখে এস । তোমার পছন্দ হলেই আমার হবে ।

সুশীলা । আমি কি তোমার চেয়ে বেশী বুঝি ? তুমি যাও ।

সুরেশ । তবে, চল, দু’জনেই যাই ।

দেই কথাই স্থির রহিল ।

যথাসময়ে সুরেশবাবু সুশীলাসুন্দরীকে লইয়া ‘মেয়ে’ দেখিতে গেলেন । মেয়েটির নাম কমলা । বয়সের চেয়ে যেন একটু ছোট দেখিতে । মুখখানি বড় সুন্দর । মেয়ে দেখিয়া দু’জনেরি বড় ভাল লাগিল । সুরেশবাবু মেয়ের জন্ম তারিখ ইত্যাদি লিখিয়া লইলেন । মণীন্দ্রের জন্ম-পত্রিকার নকল দিতে গেলে গণেশবাবু বলিলেন—আনি যোর অদৃষ্টবাদী । মানুষ দেখিয়া কিছু করিতে পারে সে বিশ্বাস আমার নাই ।

সুরেশবাবু বলিলেন—আমার এ সবে খুব আস্থা আছে । জন্ম-পত্রিকায় যদি কোন বাধা না থাকে—আর কোন আপত্তি নেই ।

ইহার পর সুরেশবাবু সুশীলাসুন্দরীকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন । পথে আসিতে আসিতে সুশীলাসুন্দরী বলিলেন, মেয়েটিকে আমার এত ভাল লেগেছিল, ইচ্ছা হচ্ছিল তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসি ।

জ্যোতিষের গণনায় এ বিবাহ রাজযোটক বলিয়া স্থির হইল । কাজেই বিবাহে কোন বাধা ঘটিলনা ।

বৈশাখের শেষের দিকে এক শুভদিনে বিবাহ সম্পন্ন হইল ।

সুশীলাসুন্দরীর আনন্দের অবধি রহিলনা ।

উষা কমলার হাত ধরিয়া সুশীলাসুন্দরীর কাছে আনিয়া বলিল—“মা কমলা আমার কথা শোনেনা।”

সুশীলাসুন্দরী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“দিদির কি কথা শোননি মা?”

কমলা বলিল—কিছু নয় মা। দিদি সেই নতুন খাবারটা কচ্ছিলেন। আমি একটু যোগাড় করে দিচ্ছিলাম; অমনি দিদি আপনার কাছে ধরে নিয়ে এলেন।

সুশীলাসুন্দরী বলিলেন, ১৫ দিন পরে তুমি মোটে কাল ভাত খেয়েছ, আজই কেন তুমি কাজ করতে গেলে মা? কাজ করতে বললে যেমন শোনা উচিত, কাজ করতে বারণ কল্পেও তেমনি শোনা উচিত। ফের যদি অসুখে পড় তাহলে যে আরও অনেক দিন দিদিকে সাহায্য করতে পারবে না।

কমলা বলিল, একটু পড়তে গেলে আপনি অসন্তুষ্ট হবেন, একটু কাজে হাত দিলে দিদি রাগ করবেন। একেবারে চুপ করে কি করে থাকি মা!

কমলা একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া চুপ করিল।

উষা তাকে বুঝাইয়া বলিল,—আচ্ছা চল, তুমি আমার কাছে বসে বসে গল্প করবে।

বলিয়া যেমন আসিয়াছিল তেমনি কমলার হাত ধরিয়া ফিরিয়া গেল।

সুশীলাসুন্দরী একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলেন—দু’টি ছেলেকে আর দু’টি বোকে এমনভাবে গুঁর কাছে যেন রেখে যেতে পারি।

সেই দিন সুরেশবাবু আফিস হইতে আসিয়া বলিলেন—“আজ একটা পরামর্শ আছে।”

ইন্দুর উপর ভার পড়িল সকলকে সংবাদ দিবার। ইন্দু একথণ্ড কাগজ বাহির করিয়া লিখিল—

কাল—সন্ধ্যা ৬।০

স্থান—হলঘর

বিষয়—পরামর্শ।

নিম্নলিখিত সভ্যগণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়—

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

„ মণীন্দ্র „ „

শ্রীযুক্তা উষা দেবী।

„ শান্তি দেবী।

„ কমলা দেবী।

জ্যেষ্ঠামহাশয়ের আদেশানুসারে

ইন্দু দেবী।

পেন্সিল লইয়া ইন্দু সকলের সহি করাইয়া আনিল। কমলা হাসিয়াই অস্থির। বলিল—ইন্দুদিদি দস্তুর মত একটা কেরাণীণি।

উষা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—সে আবার কি ?

কমলা বলিল—কেন, কেরাণী তো পুংলিঙ্গ ; ওটা ধর ইন্ভাগান্ত শব্দ ;—কাজেই স্ত্রীলিঙ্গে হ'ল কেরাণীণি।

সুশীলাসুন্দরী শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন—পাগ্লির সব তাতে খেলা।

সন্ধ্যায় সকলে একত্র হইলে সুরেশবাবু বলিলেন—আজকের পরামর্শে মণীর মতামতই বেশী দামী। তবু তোমাদের সবাইকে ডাকার উদ্দেশ্য, কোনটা উচিত অনুচিত সেটা হয়ত এতে সহজ হবে।

কথাটা কি জানিবার জন্তু সবাই একটু উৎসুক ভাবে সুরেশবাবুর পানে চাহিল।

সুরেশবাবু বলিলেন—মণীর একটা ডেপুটিগিরি একটু চেষ্টা করলেই হ'তে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে মণীর মত লওয়া প্রয়োজন।

আমার প্রথম প্রশ্ন মণীর প্রতি—চাকরিতে তোমার কোন আপত্তি আছে কিনা ?

মণীর উত্তর যেন ভাবাই ছিল। সে তৎক্ষণাৎ বলিল—চাকরি নিতে আমার মোটেই ইচ্ছে নেই—তবে আপনি যদি আদেশ করেন, আমি চাকরী নেব।

সুরেশবাবু বলিলেন, না মণি, আমি এ সম্বন্ধে তোমাদের কোন আদেশ দিতে চাইনে। তবে তুমি যদি ইচ্ছা কর একটা চাকরি পেতে পার। এ সম্বন্ধে তোমার স্বাধীন ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিতে চাই, তুমি স্বেচ্ছায় যে পথে চলবে, যাতে তুমি সুখী হবে তাতেই আমার আনন্দ। এখন তোমাদের সব কি মত বল।

সুশীলাসুন্দরী বলিলেন—মণী যাতে সুখী হয় তাই করুক। মণীরও এই মত হইল।

উষা বলিল—ঠাকুরপো ডেপুটি হন—এই আমার ইচ্ছা। ইন্দুর মত প্রফেসর হওয়া। শান্তির মত বড় উকীল বা ব্যারিষ্টার হইয়া দেশসেবক হওয়া।

সুরেশবাবু বলিলেন, এবার ছোট বোমার মত কি শোনা যাক।

কমলা একটু ভাবিয়া বলিল—এখনও আমার স্বাধীন মত বলার ক্ষমতা হয়নি। এখন মায়ের যা মত আমারও তাই।

সুরেশবাবু প্রশান্ত মুখে বলিলেন—ছোট বোমা ঠিক কথাই বলেছেন। পরে মণীন্দ্রের পানে চাহিয়া বলিলেন—তাহলে মণি ! তুমি সরকারি চাকরি থেকে মুক্তি পেলে।

ইন্দু সেই কাগজখানির উপর লিখিল—অধিকাংশের মতামুসারে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথকে ইচ্ছামত চলিবার অধিকার দেওয়া হইল।

কাগজখানি ইন্দু তখন সুরেশবাবুর সম্মুখে ধরিল।

সুরেশবাবু সব পড়িয়া মূহু হাসিয়া তাহাতে সহি করিয়া দিলেন। বলিলেন—“ইন্দুমাকে যে কাজের ভার দেওয়া হয়, তা খুব শৃঙ্খলার সঙ্গে তিনি করেন। ইন্দুমা আমাদের সভার খুব ভাল সেক্রেটারী।

৩১

গৌরান্দ্র ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া ইয়ুরোপের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানে ভ্রমণ করিতেছিল। একদিন টেলিগ্রাম আসিল, গৌরান্দ্র দেশে যাত্রা করিয়াছে। সকলেই গৌরান্দ্রের জন্ম প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

স্বামীকে দূরদেশে পাঠাইয়া শান্তির ব্যাকুলতা এতদিন কেহ বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু এখন সে আর আপনাকে স্থির রাখিতে পারিল না। গভীর রাত্রে তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইত, আর নিদ্রা আসিত না। মনে হইত, সমুদ্রের মধ্য দিয়া জাহাজ ছুটিতেছে, সেই জাহাজে গৌরান্দ্র আরোহী। বিশাল সমুদ্রের সেই তরঙ্গভঙ্গের শব্দ যেন তাহার নিদ্রাহীন কর্ণে বার বার আঘাত করিত। তাহার মনে হইত, স্থির হইয়া থাকিলে হয়ত গৌরান্দ্রের নিঃশ্বাসের শব্দ, কথার চেউ, তাহার অঙ্গের বাতাস এখনি আসিয়া পৌঁছিতে। শান্তি এই কয়েক দিনেই শীর্ণ হইয়া গেল। সুধু তাহার চোখদু’টিতে অপার্থিব উজ্জ্বলতা জাগিয়া উঠিল।

গৌরান্দ্র বোম্বাই পৌঁছিয়া টেলিগ্রাম করিতে শান্তি আর আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না। উষার কাঁধে মাথা রাখিয়া সে আনন্দে কাঁদিয়া ভাসাইল।

উষা শান্তির চোখের জল মুছাইয়া বলিল, এখন চোখের জল মুছোবার লোক আসছে, এখন কাঁদলে লাভ বই লোকসান নেই।

চোখে জল থাকিলেও শান্তির মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

গৌরাঙ্গ পূর্বেই জানাইয়াছিল যে কলিকাতার পৌছিয়া প্রথমে একবার পুরাতন বাসায় ঘাইবে যেখানে সে দীর্ঘকাল পিতামাতার সহিত বাস করিয়াছে। সেখানে পিতামাতাকে প্রণাম করিয়া পরে স্বশুর বাড়ীতে আসিবে।

ষ্টেশনে সুরেশবাবু, মণীন্দ্র ও ফণীন্দ্রের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। গৌরাঙ্গ গাড়ী হইতে নামিয়া স্বশুরকে প্রণাম করিল। সুরেশবাবু শ্রগাঢ় স্নেহে তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন। কুলি জিনিসপত্র উঠাইল; সকলে ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সুরেশবাবু বলিলেন—আমরা তাহলে তোমার জিনিসপত্র নিয়ে বাসায় ঘাই—তুমি নিজের বাসা ঘুরে শীঘ্র এস।

ফণীন্দ্র বলিল—আমরা যে তোমার জন্ত অধীর ভাবে অপেক্ষা করব তা বলাই বাহুল্য।

গৌরাঙ্গ বলিল—বাড়ীর চাবিটা—

ফণীন্দ্র বলিল—দরজা খোলা আছে চাকর একজনও বাইরে আছে। তুমি শীগ্গির যাও।

সুরেশবাবুরা আপনাদের গাড়ীতে উঠিলেন। গৌরাঙ্গ অপর একখানি গাড়ীতে উঠিয়া স্ক্রিয়া স্ট্রিটের পথে চালাইতে বলিল। পরিচিত গলিটির সম্মুখে গাড়ী থামিতে গৌরাঙ্গ নামিয়া গাড়ীর ভাড়া মিটাইয়া দিল ও গলির ভিতর প্রবেশ করিল।

বাড়ীর দরজা খোলা সেখানে একটি ভৃত্য গ্রহরী স্বরূপ দাঁড়াইয়া। গৌরাঙ্গকে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি পথ ছাড়িয়া দিল। গৌরাঙ্গ ৩ বৎসর

পরে তাহার গৃহে প্রবেশ করিল। প্রথমই সেই বাহিরের ঘর, যেখান হইতে সেদিন তাহার দেবোপম পিতাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল ; তাহার পরই তাহার পড়িবার ঘর যেখানে তাহার মাতা তাহার পিতার দ্বিতীয়বার কারাবাসের আশঙ্কায় অকস্মাৎ দেহভাগ করিলেন। কক্ষ পার হইয়া গৌরান্দ সজলনেত্রে অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল। অঙ্গন, কক্ষ সমস্ত সুন্দর ভাবে পরিষ্কৃত—কোথাও একটু অপরিচ্ছন্নতার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। কেহ যেন অতি যত্নে প্রতিদিন ইহাকে পরিচ্ছন্ন রাখিয়াছে।

অঙ্গনে জুতা খুলিয়া রাখিয়া পিতামাতার চিত্র যে কক্ষে থাকিত, গৌরান্দ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

গৌরান্দ ভূমিষ্ঠ হইয়া পিতামাতার উদ্দেশ্য প্রণাম করিল। দুই চক্ষে অশ্রুধারা বহিল।

চক্ষু মুছিতে মুছিতে গৌরান্দ অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইতে শান্তি অকস্মাৎ নত হইয়া প্রণাম করিয়া গৌরান্দের সম্মুখে দাঁড়াইল।

গৌরান্দ বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া কিছুক্ষণ শান্তির মুখের পানে চাহিয়া বলিল—“তুমি কখন এলে?”

শান্তি বৃহস্বরে বলিল—আমি সকাল থেকে এখানে আছি ; আর সেই থেকে কেবল ভাবছি—এই তুমি এলে !

পরক্ষণে দীর্ঘ অদর্শনের পর—উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইল।

গৌরাঙ্গ সুদূর প্রবাস হইতে কৃতকার্য হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে ।
সুশীলাসুন্দরীর দুর্ভাবনা দূর হইয়াছে ।

সুরেশবাবু দেখিলেন কমলার পিতামাতার সহিত গৌরাঙ্গের পরিচয়
হয় নাই, এই উপলক্ষ্যে পরিচয়াদিও হইয়া যাইবে । সেজন্য নিতান্ত
আত্মীয় ব্যতীত বাহিরের কাহাকেও বলা হইল না । সন্ধ্যার পূর্বেই
কমলার পিতামাতাকে আহ্বান করিয়া আনা হইল ।

ইন্দু ও কমলায় বড় ভাব । ঠাঁহার যাহা দরকার, দুইজনে ঘুরিয়া
ঘুরিয়া তাহাই যোগাইতে লাগিল ।

মণীন্দ্রের শ্বশুর গণেশবাবু কয়েকবার ইন্দুর পানে চাহিয়া দেখিলেন ।
কেবাল ঠাঁহার মনে হইতে লাগিল, যেন ওই মেয়েটি ঠাঁহার বড় পরিচিত
—কোথাও যেন দেখিয়াছেন । সহসা একটা কথা বিছাতের মত ঠাঁহার
মনে হইল । তিনি চমকিয়া উঠিলেন । আবার ভাবিলেন, না তাহা
সম্ভব নহে । কিন্তু যদি হয় ?—একবার সন্ধান লইতে হইবে । তিনি সে
চিন্তাকে আর মনোমধ্যে স্থান দিলেন না ।

জলযোগাদির পর সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল মণীন্দ্রকে গান গাহিতে
হইবে । মণীন্দ্রের শ্বশুরেরই গান শুনিবার বেশী আগ্রহ ; কারণ গানের
মধ্য দিয়াই ঠাঁহার জামাতার সহিত ঠাঁহার প্রথম পরিচয় ।

অতি সুকণ্ঠ হইলেও গান গাহিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করা বা অনর্থক
দেবী করা মণীন্দ্রের স্বভাববিরুদ্ধ । সে সুধু বলিল—“আমি কিন্তু ‘স্বদেশী’
গান গাইব ।” কেহ কিছু বলিবার আগে মণীন্দ্রের শ্বশুর বলিলেন—

“নিশ্চয় । আমি তোমার কাছে স্বদেশী গানই শুনতে চাই । তুমি সেই গানটা একবার গাও তো বাবা—

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক
জগতজনের শ্রবণ জুড়াক ।

এ গান কখনো পুরাণো হয় না ।”

মণীন্দ্র বিনা আপত্তিতে উঠিয়া হারমনিয়মের কাছে আসিয়া বসিল । একটিবার চক্ষু মুদ্রিয়া যেন সেই কবি বর্ণিত জনসঙ্ঘের মধ্যে আপনাকে লইয়া গেল যেখানে কবি সকলকে বলিতেছেন—তোমরা আলস্য পরিহার করিয়া একবার উঠ ; ভাইকে ভাই বলিয়া চেন ; মাকে মা বলিয়া ডাকিতে শিখ । তাহা হইলে তোমাদের সকল দুঃখের অবসান হইবে, সকল দুঃখ দূর হইবে, জগতে তোমাদের স্থান হইবে ।

তারপর মণীন্দ্র গাহিল :—

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক
জগতজনের শ্রবণ জুড়াক,
হিমাদ্রি পাষণ কেঁদে গলে যাক,
মুখ ভুলে আজি চাহরে ।
দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি,
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজুলি,
প্রভাত গগনে কোটি শির তুলি
নির্ভয়ে আজি গাহরে ।
বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে,
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘিরিলে
দশদিক্ স্মখে হাসিবে ।

সেদিন প্রভাতে নূতন তপন,
 নূতন জীবন করিবে বপন,
 এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন,
 আসিবে সেদিন আসিবে ।
 আপনার মায়ে মা বলে ডাকিলে,
 আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে,
 সব পাপ তাপ দূরে যায় চলে
 পুণ্য প্রেমের বাতাসে ।
 সেখায় বিরাজে দেব-আশীর্বাদ,
 না থাকে কলহ, না থাকে বিবাদ,
 যুচে অপমান. জেগে ওঠে প্রাণ,
 বিমল প্রতিভা বিকাশে ।

সমস্ত প্রাণ দিয়া মণীন্দ্র এগান গাহিয়া গেল । ছেলে যাকে মা বলিয়া
 ডাকে নাই, মা বলিয়া চিনে নাই, সে দুঃখ মায়ের প্রাণে হিমাদ্রি পাষাণের
 মত জাগিয়া আছে । একবার মা ডাক শুনিবামাত্র সে দুঃখের
 পাষণ-অশ্রুজলে গলিয়া যাইবে ; মায়ের চক্ষে আনন্দের শতদল ফুটিয়া
 উঠিবে ।

এই চিত্রটি সবারি চক্ষুর সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল ।

যখন গান শেষ হইল সকলেরই চক্ষু তখন অশ্রুভরা । ক্ষণকালের
 জন্য যেন সকলে স্বর্গলোকে প্রবেশের অধিকার পাইয়া মুগ্ধ নয়নে সেখানকার
 অপূর্ব সৌন্দর্য উপভোগ করিয়া লইয়াছিল ।

গোরাক্ষ বলিল—মণি, সার্থক গান নিখিয়াছিলে !

তখন পিতা মাতা স্বপ্নের সকলেই কাছে গিয়া তাহাকে অভিনন্দিত
 করিল ।

কমলা পর্য্যন্ত আগাইয়া গিয়াছিল। মুখে কিছু না বলিলেও তাহার আনন্দবিকশিতচক্ষুর প্রশংসার বাণী কাহারও অজ্ঞাত রহিল না।

ইন্দুও সব শেষে উঠিয়া আসিয়াছিল; কিন্তু মুখে কোন কথা ফুটে নাই।

তারপর আহারের আহ্বান। একে একে সকলেই আহারে বসিলেন। বসিল না কেবল ইন্দু। সঙ্গীতের আবেশ এখনও তাহার মন হইতে দূর হয় নাই। অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করিয়া সে শুইয়া পড়িল। শুধু স্মৃশীলা-সুন্দরীর কাছে বলিয়া গেল সে থাইবে না, বুক কেমন করিতেছে।

আহারাঙ্গি মিটিয়া গেল। অতিথিরা সবাই বিদায় লইল। বাড়ীর সকলে আপন আপন কক্ষে শয়ন করিতে গেল।

অনেক রাত্রে স্মৃশীলাসুন্দরীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে তাঁহার ইন্দুর কথা মনে পড়িল। ইন্দু কেমন আছে দেখিবার জন্ত তিনি ধীরে ধীরে আপনার কক্ষ হইতে বাহির হইয়া ইন্দুর কক্ষে গেলেন। দেখিলেন, ঘরে আলো জ্বলিতেছে, কিন্তু ইন্দু শয্যায় নাই।

তবে কি সে ভুলক্রমে হৃৎবেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে? ব্যস্ত হইয়া তিনি হৃৎবেয়ের দিকে চাহিলেন। ঘরে প্রবেশ করিতে যাইবেন, এমন সময়ে সেই কক্ষের উজ্জ্বল আলোকে দেখিলেন, যে আসনে মণীন্দ্র বসিয়াছিল, সেই আসনখানি দুই হাতে বুক জড়াইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

তাঁহার আর বুদ্ধিতে কিছু বাকি রহিল না। ইন্দুর মনের গোপন কথাটা মুহূর্ত্তে তাঁহার কাছে বিদ্যুতালোকে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। তখন তিনি ফিরিয়া গেলেন। গভীর দুঃখে ও ব্যর্থ শোকের তপস্যা ভাঙ্গিতে সাহস হইল না।

হায় অভাগিনী পিতৃ মাতৃহীনা, কেন এমন করিয়া মণীন্দ্রকে ভালবাসিলি? ভালবাসিলি তো আগে কেন একটবার ঘৃণাঙ্করেও জানিতে দিলি না?

কথাটা সুশীলাসুন্দরী অতি গোপনে স্বামীকে বলিলেন। দু'জনে চিন্তাশ্রিতচিত্তে কিছুক্ষণ পরামর্শ করিলেন।

পরদিন সুশীলাসুন্দরী বাড়ীতে ইচ্ছা করিয়াই রাষ্ট্র করিয়া দিলেন, এবার ইন্দুর বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে।

শুনিয়া কমলা আনন্দে অধীর হইয়া পড়িল; ইন্দু বড়ই গম্ভীর হইল।

মাস তিনেক পরেই ইন্দু ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিল। এবার ইন্দু সুশীলাসুন্দরীকে বলিল—আমি এখন পড় মা।

সুশীলাসুন্দরী ইন্দুর চিবুকে হাতদিয়া আদর করিয়া বলিলেন—“এখন যে পরের ঘরে যাবার সময় হয়ে এল মা; আর বেশী দিন রাখতে পারব না। এবার থেকে ঘরে বসে পড় মা।”

ইন্দু কাতর হইয়া বলিল—আমাকে আই-এ পর্য্যন্ত পড়তে দিন মা—আপনার পায়ে পড়ি।

সুশীলাসুন্দরী বলিলেন—কি কর মা—ওঁর ইচ্ছা যে বিয়েটা শীঘ্র হয়ে যায়। উনি বলছিলেন, ইন্দুর বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত ওঁর একটা মন্ত কর্তব্য থাকি থাকবে।

ইন্দু এবার কাঁদকাঁদ হইয়া বলিল—আপনি একটু ভালকরে বলুন মা তাহলে জ্যাঠামশায় আপত্তি করবেন না।

ইন্দু সুরেশবাবুকে জ্যাঠামশায় বলিত, কিন্তু সুশীলাসুন্দরীকে জ্যাঠাইমা না বলিয়া ‘মা’ বলিত।

ইন্দু পড়িবার অহুমতি পাইয়া আই-এ পড়িতে লাগিল।

বিবাহ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেও ইন্দু মুখ ফুটিয়া সে

কথা কাহাকেও বলিতে পারিল না, পাছে তাহার মনের গোপন কথা কেহ ধরিয়া ফেলে। সুশীলাসুন্দরী যে তাহাকে সে রাত্রে মণীন্দ্রের আসনে লুটাইয়া কাঁদিতে দেখিয়াছিলেন সে কথা সে মোটেই জানিতে পারে নাই; পারিলে সে কি করিত বলা যায় না।

ভাবিয়া ভাবিয়া ইন্দু এক উপায় স্থির করিল ও তাহাই অবলম্বন করিল। সে খুব মন দিয়া পড়িতে লাগিল। কলেজে শীঘ্রই তাহার সুনাম হইল। বাড়ীতেও সকলে তাহার পাঠানুরাগ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল। তাহারই অবসর দেখিত, তাহারই নিকট হইতে পুস্তকের কঠিন অংশ বুঝাইয়া লইত। যে লেখকের একখানি পুস্তক পড়িবার কথা, বাড়ীর লাইব্রেরী হইতে লইয়া সেই লেখকের ৩৪ খানি পুস্তক সে পড়িয়া ফেলিল। মাস কয়েকের মধ্যেই ইন্দুর তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া মণীন্দ্র চমৎকৃত হইল।

ইন্দুর বিবাহের চেষ্টা দেখিয়া মণীন্দ্র একদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পিতাকে বলিল—“আই এটা পাশ করার পর ইন্দুর বিবাহ দিলে ভাল হয়না বাবা?”

মণীন্দ্রও মাঝে মাঝে ইন্দুকে পাঠ বুঝাইয়া দিত। যে সময়ে মণীন্দ্র তাহাকে পড়াইত ইন্দু তাহার মুখের পানে চাহিয়া তন্ময় হইয়া পড়া শুনিত। পাঠ্য বিষয়ের চেয়ে মণীন্দ্রের কণ্ঠস্বর, তাহার বলিবার ভঙ্গী, সর্বোপরি মণীন্দ্রের সান্নিধ্য ইন্দুর কাছে বহুগুণে প্রিয়তর বলিয়া মনে হইত। অধিক রাত্রে একা ঘরে বসিয়া পড়িবার সময়ে তাহার মনে হইত, চিরকাল পড়িবার অধিকার ও মণীন্দ্রের সান্নিধ্য—এই দু’টি পাইলেই সে জীবনটা একরকমে কাটাইয়া দিতে পারে। সে আর কিছুই চাহে না।

কিন্তু সত্যই কি সে আর কিছু চায় না? মণীন্দ্রের দিকে চাহিয়া মণীন্দ্রের কথা ভাবিয়া, কমলার প্রতি মণীন্দ্রের অনুরাগের কথা কমলার মুখে শুনিয়া তাহার প্রাণ এক একবার হাহাকার করিয়া উঠিত।

কমলার পিতা এক সন্ধ্যায় কমলাকে দেখিতে আসিলেন। সুরেশবাবু তখন বাড়াতেই। কমলার সঙ্গে কথাবার্তা কহিবার পর তিনি সুরেশবাবুর কাছে আসিয়া বসিলেন। দুই বৈবাহিককে কথা হইতে লাগিল।

সুরেশবাবু। আমার ইন্দুরার এবার একটা সম্বন্ধ দেখতে হবে এবার—

গণেশবাবু। বেশ; ইন্দুর সঙ্গে আপনার ঠিক সম্পর্কটা কি?

সুরেশবাবু। ওঃ সে কথা বৃষ্টি আপনাকে বলাই হয়নি। তবে শুনুন। ইন্দুর সঙ্গে ঠিক কোন সম্পর্কই নেই। ওটি আমার পালিতা কন্যা—অংশু ব্রাহ্মণ কন্যা।

গণেশবাবু। ইন্দুর বাপের নাম কি?

সুরেশবাবু। সঞ্জীব রায়।

গণেশবাবু। রায়? সঞ্জীবচন্দ্র রায়?

সুরেশবাবু। হাঁ—কেন আপনি কি চেনেন?

গণেশবাবু। না, ঠিক চিনি, —তবে নামটা যেন জানা মনে হচ্ছে।

সুরেশবাবু। বাল্গমচন্দ্রের ভাই সঞ্জীবচন্দ্র—সেই হিসাবে নামটা বোধহয় জানা মনে হচ্ছে।

গণেশবাবু। হব। আচ্ছা, মেয়েটিকে কোথায় পান?

সুরেশবাবু। মেহেরপুরে।

সুরেশবাবু তখন ইন্দুর পাওয়ার ইতিহাস সংক্ষেপে বলিলেন।

গণেশবাবু কিছুক্ষণ চিন্তানগ্ন রহিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—
সঞ্জীবের পিতার নাম জানতে পেরেছিলেন কি?

সুরেশবাবু। না, তা পারিনি; তবে এইটুকু জানতে পেরেছিলাম যে, সঞ্জীবের বাপ খুব বড় জমিদারের ছেলে ছিলেন, বাপের অজ্ঞাতসারে সঞ্জীবের মাকে বিবাহ করেছিলেন; পরে সম্ভবতঃ সে বিবাহ গোপন রেখে পুনরায় বিবাহ করতে বাধ্য হন। দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেরাই হয়ত সব

ভোগ দখল করছে। আর সঞ্জীব বেচারি ভিখারীর চেয়েও কষ্টে দিন কাটিয়েছে। ওঃ সঞ্জীব যে ডায়েরি রেখে গেছে—তা পড়তে শত্রুর চোখেও জল আসে।

আপনাকে যেন বড় অনমনস্ক দেখাচ্ছে। শরীর ভাল তো ?

গণেশবাবু। না, শরীরটা কদিন থেকে খারাপ যাচ্ছে,—আজ আরও খারাপ, এখন তবে উঠি।

সুরেশবাবু। আসুন তবে। আমিই একদিন যাব শীগগির। মেয়েটির জন্ম একটি ভাল পাত্র সন্ধান করবেন যেন।

গণেশবাবু। হ্যাঁ, করব ; যথাসাধ্যই করব।

কথাবার্তার পর গণেশবাবু অত্যন্ত চিন্তাঘ্নিতভাবে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

৩৪

পরদিন প্রভাতেই বৈবাহিকের বাড়ী হইতে একখানি পত্র লইয়া একজন প্রৌঢ় কর্মচারী আসিলেন। যদি অসুবিধা না হয়, সকালেই একবার কমলাকে পাঠাইয়া দিবার জন্ম অনুরোধ করিয়াছেন আর লিখিয়াছেন রাত্রি হইতে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পাড়িয়াছেন সে জন্ম নিজে আসিতে পারিলেন না।

সুরেশবাবু কর্মচারীকে বলিয়া দিলেন—আপনি গিয়া বলুন ঘণ্টাখানাকের মধ্যে মণী বৌমাকে নিয়ে যাচ্ছেন। পিতার আদেশে মণীন্দ্র কমলাকে স্বশুর বাড়ী পৌছাইয়া স্বশুরের কাছে খানিকক্ষণ বসিয়া ফিরিয়া আসিল।

সন্ধ্যায় সুরেশবাবু স্বয়ং বৈবাহিককে দেখিতে আসিলেন।

ঠাঁহাকে দেখিয়াই সুরেশবাবু চমকিয়া বলিলেন—এ কি ! একদিনে আপনার চেহারা কি হয়ে গেছে ।

গণেশবাবু ম্লান হাসিয়া বলিলেন—বসুন, তাই তো আপনাকে ডেকেছি ।

সুরেশবাবু একটু বিস্ময়ভাবে বৈবাহিকের পানে চাহিয়া বসিলেন ।

গণেশবাবু বলিতে লাগলেন—

টাকিতে আমি আর সদানন্দ বরাবর একসঙ্গে পড়েছি, যদিও আমি সদানন্দের চেয়ে বছর কয়েকের ছোট ছিলাম । একই বছরে দু'জনে এন্ট্রান্স পাশ করি । সদানন্দ বিখ্যাত জমীদার ভুবন বাঁড়ুয়্যেব একমাত্র ছেলে । আমি সামান্ত গৃহস্থের ছেলে মাত্র । কল্কাতায় রেখে কলেজে পড়াবার ক্ষমতা আমার বাবার ছিলনা । সদানন্দের চেষ্ঠায় তার সঙ্গে কল্কাতায় এক বাসায় থেকে আমার কলেজে পড়াবার ব্যবস্থা হ'ল ।

আমি গরীবের ছেলে, পড়াবার সুযোগ পেয়ে শুধু সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার কবেছি । অন্যদিকে চেয়ে দেখবার অবসর পাইনি । সদানন্দ বড় লোকের ছেলে—শুধু পড়া নিয়ে থাকত না, গান বাজনা করা, বন্ধুবান্ধবের বাড়ী যাওয়া আসা এ সবই তার ছিল । তা বলে সে পড়াতে আমার চেয়ে বিশেষ কম যতনা ।

এফ-এ পাশ করার পর দু'জনে বি-এ পড়ছি তখন । এক রাত্রে সদানন্দ বাড়ী এলনা । রাত্রে সে কখনও বাইরে থাকত না, চরিত্রও তার নিষ্কলঙ্ক ছিল । আমি একটু ভাবিত হ'লাম । পরদিন সকালে সদানন্দ ফিরল । তাকে একটু চিন্তিত মনে হ'ল । কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই সদানন্দ আমাকে নির্জনে ডেকে বললেন—“গণেশ, কাল রাতে আমি বিবাহ করেছি ।”

সে কি ! আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম ! তখন সদানন্দ

সংক্ষেপে বললে, ক্রাসের একটি ছেলের বাড়ীতে সে মাঝে মাঝে যেত। তার দূর সম্পর্কের একটি ভাইঝি তার বিধবা মায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাদের বাড়ী আসত। মেয়েটি বড় সুন্দর ও শান্ত, বাপের কাছে বেশ লেখাপড়াও শিখেছিল। বিবাহ-যোগ্য বয়স হলেও পয়সা অভাবে মেয়েটির বিবাহ হাচ্ছিল না। মেয়েটির মা এ কথা কাঁদতে কাঁদতে সদানন্দের কাছে বলেছিলেন। মেয়েটির মায়ের অশ্রুজল ও মেয়েটির সুন্দর মুখ সদানন্দকে এতই বিচলিত করোছিল যে মেয়েটিকে বিবাহ না করে সে পারেনি।

আমি সমস্ত শুনে সভয়ে বললাম—বিবাহ তো করেছ—তারপর? জ্যাঠামশায় শুনে ক'র বলবেন?

জ্যাঠামশায় :ছেন সদানন্দের বাবা। তিনি যে রকম গস্তীর ও একরোখা মানুষ,—এ খবর শুনে যে কি করবেন তাই হ'ল আমার সব চেয়ে ভয়ের বিষয়।

তখন দু'জনে মিলে পরামর্শ করে স্থির করলাম, এ বিবাহের কথা এখন কিছুতেই তাঁকে জানতে দেওয়া হবেনা। তারপর সুবিধা বুঝে তাঁকে জানানো হবে। বেলঘরের কাছে নিমতিতা গ্রামে মেয়েটির বাপের বাড়ী। সংসার তাদের অতিকষ্টে চলে। কল্কাতার বাসায় খরচ থেকে বাঁচিয়ে নিয়মিতভাবে তাঁদের কিছু দিতে হবে। আমরা এই ভাবেই চলতে লাগলাম। সদানন্দ মাঝে মাঝে নিমতিতা যেত। কখন বা ছপুরে গিয়ে রাত্রে ফিরত, কখন বা রাত্রে গিয়ে সকালে আসত। জ্যাঠামশায় কখন কখন অতর্কিতভাবে কল্কাতা এসে পড়তেন; আসার উদ্দেশ্য ছিল, আমরা কি ভাবে চলছি তাই দেখা। টাকীর দুই একজন লোককে আমরা বলে রেখেছিলাম, উনি আসবার আগে যেন আমরা খবর পাই। তা হলেও কিন্তু আমাদের নিশ্চিন্ত হবার যো ছিলনা। কারণ, এমনও

মাঝে মাঝে ঘটত, পত্র পেলাম ৭ দিন পরে তিনি আসবেন—অথচ এলেন পত্র পাবার একদিন পরেই !

যে বছর আমরা বি-এ, পাশ করি, সেই বছরেই সদানন্দের একটি পুত্র জন্মে। যথাসময়ে ছেলেটির নাম রাখা হ'ল। সঞ্জীবনাথ আমিই রাখতে বলি। তখন আমরা বি-এল পড়ি। বি-এল পরীক্ষা হতে মাস ছয় দেরী আছে এমন সময় একদিন আমরা খবর পেলাম, বিবাহের শুভব তাঁর কাণে গিয়াছে এবং শীঘ্রই অনুসন্ধানের জন্ত কাউকে এখানে পাঠানো হবে।

তাঁর ক্রোধ ও সেই ক্রোধের ফল আমাদের খুব ভালই জানা ছিল। সদানন্দ তো ভয়ে অস্থির হয়ে পড়ল। দুঃস্বপ্নই মনে হ'ল—নিমত্তিতা কলকাতা থেকে বেশী দূর নয় সেখানে গৌড় নিষ্ঠ কাতারাত বিচিত্র নয়। সদানন্দ সেই রায়েই নিমত্তিতা চলে গেল। তার পরের দিন সন্ধ্যার পর সে অত্যন্ত ক্লান্ত ও ম্লিয়মাণ হয়ে ফিরে এল। শুন্সান তাঁদের সব মেহেরপুরে রেখে এসেছে। মেহেরপুর সদানন্দের স্বীর মামার বাড়ী।

তার এক সপ্তাহ পরে সদানন্দের উপর হঠাৎ আদেশ এল বাড়ী ফিরে যেতে। আইন অধ্যয়ন অসমাপ্ত রেখেই তাকে যেতে হল। জ্যাঠামশায় এমন ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন যে বাড়ী পৌঁছবার পরদিনই তাকে পুনরায় বিবাহ করতে হয়। আগের বিবাহের কথা প্রকাশ করে বন্সবার সুযোগ ও সাহস তার হয়নি। সেই থেকে সদানন্দের পঠদশার শেষ হয়।

পড়বার সময়ে কিছু টাকা তার আমার কাছে জমা ছিল। তারপর সুযোগ পেলেই কিছু কিছু টাকা আমার কাছে লোকের হাত দিয়ে সে পাঠিয়ে দিত। আমাকে সে ঠিকানা দিয়ে গিয়েছিল, সেই ঠিকানায় মাসে মাসে টাকা আমিই পাঠিয়ে দিতাম। উকীল হয়ে আমি দেশে এসে বসি ; তারপর কিছু পসার হলে তবে আমি বিবাহ করি। তখনও আমার হাত দিয়ে টাকা যেত।

সদানন্দের মা বালাকালেই মারা যান—তা নইলে মায়ের মুখ দিয়ে বাপকে বিবাহের কথাটা হয়ত সে বলতেও পারত। পূর্ব বিবাহের কথা বাবাকে বলবার জন্য সদানন্দ মাঝে মাঝে অধীর হয়ে উঠত; কিন্তু একটা না একটা বাঘাত ঘটায় সে কথা আর বলা হ'লনা। এইভাবে বোধ হয় ১০।১২ বৎসর কেটে যায়।

এই সময়ে জ্যাঠামশায় জ্বাতিসারে মরণাপন্ন হন। রোগ থেকে অতি কষ্টে রক্ষা পেয়ে তাঁর তীর্থভ্রমণের সাধ হ'ল। সদানন্দ তাঁর স্ত্রী এবং দুচার জন লোক সঙ্গে নিয়ে তিনি বা'র হন।

তখন পূজার ছুটিতে কোট বন্ধ—আমি সত্ৰীক পুরী চলে গেছি। বাবার আগে আমি সদানন্দকে বলে যাই, সে যেন যথাসময়ে টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করে। সেও বলে, তুমি আর কতাদন এভার বইবে; আমি এর ব্যবস্থা করব।

মফসলের একজন কর্মচারীর হাতে সে কিছু টাকা ও ঠিকানা রেখে দায় ও বলে যায় যেন নিয়মিত ভাবে টাকা পাঠানো হয়। দরকার হলে ম্যানেজারের কাছে এসে সে যেন টাকা নিয়ে যায়। ম্যানেজারকেও সে ঐ সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিয়ে যায়।

নানা তীর্থে ঘুর কাশী এস জ্যাঠামশায় কিছুকাল বাস করেন। সেখানে হঠাৎ কলেরায় আক্রান্ত হয়ে জ্যাঠামশায় ও সদানন্দের স্ত্রী দুজনেই মারা যান। বৎসর দেড়েক পরে সদানন্দ একা দেশে ফিরে এল। তখন সে বিস্তীর্ণ জমিদারীর একমাত্র মালিক।

শ্রদ্ধাদি শেষ হলে সদানন্দ সে কর্মচারীকে ডেকে পাঠালে। তাঁর কথাবার্তার কেমন তাঁর প্রতি সদানন্দের সন্দেহ হ'ল। এ পর্যন্ত কত টাকা পাঠিয়েছে তাঁর হিসাবএ টাকা পাঠানোর রসিদ দেখতে চাইলে কর্মচারী তা দেখাতে পারলে না। ডাক ঘরে থবব

নিতে জানা গেল, মাত্র ছমাস সে নিয়মিতভাবে টাকা পাঠিয়েছিল—তারপর একবারে বন্ধ। অথচ তার নাম করে ম্যানেজারের কাছ থেকেও মাসে মাসে সে টাকা নিয়ে গেছে! খুব উদ্ভিগ্ন হয়ে সদানন্দ টেলিগ্রাফে ১০০০ টাকা তখনি পাঠিয়ে দিলে, টাকা ফিরে এল। তার নিজের যেতে সাহস হ'লনা, তাই একজন কর্মচারীকে সে পাঠিয়ে দিলে খবর নিয়ে আসতে। দিন দুই পরে সে খবর নিয়ে এল—সঞ্জীব রায়ের মা মারা গেছেন এক প্রকার অনাহারে, সঞ্জীব মারা গেছে জেনে, সঞ্জীবের স্ত্রী জলে ডুবে মারা গেছে; সঞ্জীবের একটি মেয়ে ছিল, তাকে কে নিয়ে গেছে—কোন অনাথা আশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, কি মারা গেছে, কেউ জানেনা।

খবর শুনে সদানন্দ এত মুগ্ধে গেল যে, কিছুকাল সে কারও সঙ্গে কথা পর্যন্ত কইলে না। অনেক দিন পরে সে আমাকে ডেকে পাঠালে ও তার ষ্টেটে আমাকে প্রধান ম্যানেজার করে রাখলে। সঞ্জীবের মেয়ের খোঁজ করার কথা বললে সে ব্রান হেসে বলত—তাকে যদি পাবার হ'ত, এমন কখন হয়। স্ত্রী মারা গেছে অনাহারে, পুত্র মারা গেল জেনে, পুত্রবধু উদ্বন্ধনে, পৌত্রী হয়ত মারা গেছে না হয় কোন অনাথাশ্রমে; কোন মুখে খোঁজ নেব?

আমারও বিশ্বাস হয়েছিল সে হয়ত অনাথাশ্রমেই আছে। গোপনে খোঁজও করেছিলাম—কিন্তু কোনও খোঁজ পাইনি।

সদানন্দের মনে বড়ই আঁধার লেগেছিল। কতবার আমার কাছে সে দুঃখ করেছে যে তার পাপের ফল সে আজ ভোগ করছে। বিষয় সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবার ভয়ে—সে বাপের কাছে বিবাহের কথা বলেনি, স্ত্রী পুত্রকে অনাহারে হত্যা করেছে—আজ তাই অগাধ সম্পত্তি পেয়েও সে নিঃস ও সর্কারিক্ত।

সদানন্দ প্রায়ই বলত সে আর বেশা দিন বাঁচবেনা। বেঁচে থাকতেই

সে কিছু সম্পত্তি লোক হিতার্থে দিয়ে যায় এবং তার বাকি সমস্ত সম্পত্তির ট্রাস্টি সে আমাকেই নিযুক্ত করে। সদানন্দ একটা উইলও করে যে তার মৃত পুত্রের কোন সম্ভান-সম্ভতি যদি পাওয়া যায় সেই অর্ধেক সম্পত্তি পাবে—বাকি অর্ধেক আমিই পাব। সে উইলে ইহারও উল্লেখ থাকে যে যদি তার মৃত পুত্রের সম্ভান সম্ভতির কোন সন্ধান না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সমস্ত সম্পত্তি আমারই হইবে।

নরবার একদিন আগে সদানন্দ আমাকে ডেকে বলে—গণেশ, আমি ত চললাম। সঞ্জীবের মেয়ে হয়ত বেঁচে থাকতেও পারে। আমি দারুণ ক্ষোভে ও লজ্জায় সে সন্ধান ভাল করে নিতে পারিনি, তুমি তা নিও। তারপর উইল রইল।

পরদিনই সদানন্দ মারা গেল।

৩৫

সুরেশবাবু এতক্ষণ চিত্রাপিতের মত বসিয়া অবাক বিষ্ময়ে ইন্দুর পিতা-মহের কথা শুনিতেন। গণেশবাবু ক্ষণকালের জন্তু চুপ করিলে তবে যেন তাঁহার জ্ঞান হইল।

একটু থামিয়া গণেশবাবু আবার আরম্ভ করিলেন—এবার যেটুকু বলব তা আমারই কলঙ্কের কথা। সদানন্দ মারা গেলে কিছুদিন আমি সঞ্জীবের মেয়ের জন্তু ২।১ স্থানে সত্যই খোঁজ করেছিলাম। কিন্তু কোন খোঁজ পাইনি। শেষের দিকে খোঁজ নিতে যেন একটু ভয় ভয় করত।

পূর্বেই বলেছি আমি সদানন্দের চেয়ে বছর কয়েকের ছোট ছিলাম; তারপর বিয়েও করেছিলাম অনেক দেবীতে। বছর দশেকের মধ্যে আমাদের কোন সম্ভানাদি হয়নি। সম্ভানের আশা একপ্রকার ছেড়েই

দিয়েছিলাম এমন সময় আমাদের একটি কণ্ঠা জন্মে। সেই কমলা—
আমাদের একমাত্র সন্তান। যখন কমলা জন্মায় আমার স্ত্রীর বয়স তখন
প্রায় পঁচিশ হবে। কাজেই কমলার উপর টান স্বভাবতঃই আমার বেশী
হয়েছিল।

সঞ্জীবের মেয়ের কোন সন্ধান না পেলে সমস্ত সম্পত্তিই আমার কমলা
পাবে—এই উইলের সৰ্ত্ত। সন্ধান পেলে কমলা অর্ধেক সম্পত্তি থেকে
বঞ্চিত হবে—ক্রমশঃ কথাটা এইভাবেই আমার মনে উদর হতে লাগল।
মানুষের লোভ এমনি ভীষণ, যে সম্পত্তি আমি এখন ভোগ করছি তার
কুড়ি ভাগের এক ভাগ পেলেই ওকালতীর সময়েও আমি আপনাকে
অসীম সৌভাগ্যবান্ জ্ঞান কর্তাম; আর এখন সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেক
পেয়েও আমি সুখী নই। শেষে এমন হ'ল—অপরিচিত লোক হঠাৎ
কাছে এলে মনে ভয় হ'ত বুকি বা সঞ্জীবের মেয়ের সংবাদ নিয়ে এল।
ক্রমশঃ সে ভাব দূর হ'ল। চার পাঁচ বছরের মধ্যেও কোন সংবাদ না
পেয়ে আমি নিশ্চিত হ'লাম যে সে বেঁচে নেই। সমস্ত সম্পত্তিই আমার
এই সিদ্ধান্তই হয়ে রইল।

ইন্দুকে দেখে অবধি আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। ইন্দুর মুখের
ভাব অবিকল সদানন্দের মত। তাই প্রথম দিনই ইন্দুকে দেখে আমি
চমকে উঠি। কাল হঠাৎ আপনার মুখে ইন্দুর বাপের পরিচয় পেয়ে আমি
নিঃসন্দেহে বুঝলাম এই সঞ্জীবের মেয়ে।

রাত্রে বাড়ী ফিরে এসে সমস্ত রাত্রি ভেবেছি কি করি। শেষে
সাব্যস্ত করলাম—এতদিন কমলা জেনে এসেছে সেই সমস্ত সম্পত্তির
উত্তরাধিকারিণী; তাকে একবার কথাটা জানান প্রয়োজন।

কমলা এলে তাকে সমস্ত কথা খুলে বলে তার মত জিজ্ঞাসা
করলাম। তার চোখ দু'টি জলে ভরে এল। চোখ মুছে বললে—আহা,

ইন্দু ঠাকুরঝি এতবড় লোকের পোতী হয়ে কতকষ্ট পেয়েছে ! আমার শশুর যদি তাঁকে আশ্রয় না দিতেন তাহলে তার কি দশা হ'ত ! আপনার হাত থেকে যদি সব বিষয় চলে যায় তবে আপনি ইন্দু-ঠাকুরঝির প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করুন ।

মানুষ যত বেশী পায় ততই তার লোভ বেড়ে যায় । গরীব ছিলাম, একদিন কিন্তু সম্পত্তি হাতে পেয়ে তার অদ্ভুত ছেড়ে দিতে মন সরছিল না । কমলার কথায় আমার মনে আর দ্বিধা রইলনা । এখন আপনি ইন্দুর অভিভাবক, ইন্দুর সম্পত্তি দিয়ে ইন্দুকে দিয়ে আমাকে দায়মুক্ত করণ, আর আমার পাপ ও দুর্বলতা ক্ষমা করুন ।

সব শুনিয়া সুরেশবাবু বলিলেন—মানুষ দুর্বল । এ দুর্বলতা যে শেষে আপনি জয় করেছেন, এতেই আপনার বা অন্তায় ছিল তা ধুয়ে মুছে গেছে । ছোটবোমা যে একথা বলেছেন, শুনে আমি বড় আনন্দ পেলাম, তাঁর উপযুক্ত কথাই তিনি বলেছেন ।

কিছুক্ষণ পরে সুরেশবাবু কমলাকে সঙ্গে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন । পথে কমলাকে তিনি বলিলেন—মা, তুমি তোমার বাবাকে যে কথা বলেছ, শুনে আমি বড় সুখী হয়েছি । তুমি প্রকৃতই বড় বরের মেয়ে । অনেক ভাগ্যে আমি এমন মা পেয়েছি । এখন আর ইন্দুকে এসব বলে কাজ নেই । আমি যথাসময়ে যে রকমে বলা উচিত তাই বলব ।

কমলা বলিল—হ্যাঁ বাবা, তাই বলবেন ।

বলিতে বলিতে গাড়ী বাসার সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিল ।

জ্যাঠামশায় আমাকে ডেকেছেন ?

ইন্দু কলেজ হইতে ফিরিবার একটু পরে সুরেশ বাবুর সম্মুখে আসিয়া
জিজ্ঞাসা করিল। সুনীলাসুন্দরীও সেখানে ছিলেন।

হ্যাঁ মা, একবার ডেকেছি। তুমি এসে জলটল খেয়েছে তো ?

হ্যাঁ, খেয়েছি।

একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা তোমাকে বলবার আছে মা।

ইন্দু কিছু না বলিয়া উদ্বিগ্নভাবে সুরেশবাবুর পানে চাহিয়া রহিল।

সুরেশবাবু বলিলেন—দেখ মা, যে কথা তোমাকে বলতে যাচ্ছি, তাতে
তোমার বাল্যকালের কথা একটু আধটু বলতে হবে; তার জন্য দুঃখিত
হোয়োনা। তোমার মনে আছে বোধ হয় আমরা মেহেরপুরে তোমাকে
পাই। সেখানে তোমার পরিচয় জানবার জন্য সে সময়ে আমি অনেক
চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কিছুই তেমন জানতে পারিনি। তোমার বাবার
ডায়েরি লেখা অভ্যাস ছিল; তা থেকে শুধু এইটুকু জেনেছিলাম তোমার
ঠাকুরমাকে এক জমীদারের ছেলে তাঁর পিতার অজ্ঞাতসারে বিবাহ
করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, কিছুদিন পরে তিনি তাঁর পিতাকে
একথা বলবেন; কিন্তু কোন দিনই একথা প্রকাশ করতে সাহস করেন
নি। ফলে তাঁকে আর একটি বিবাহ কর্তে হয়, আর এ বিবাহের কথা
অজ্ঞাতই থেকে যায়। তোমার ঠাকুরমার কাছে নিয়ম মত খরচের
টাকা আসত। তিনি মারা যাওয়ার কয়েক মাস পরেই খরচের টাকা
আসা হঠাৎ বন্দ হয়ে যায়। তোমায় বাবার তাতে পড়া বন্দ করতে হয়
এবং তিনি অনেক কষ্ট পান। তোমার বাবা লেখাপড়ায় স্বভাব চরিত্রে

খুব ভাল ছিলেন ; ভাল অবস্থায় পড়লে তিনি একজন মহৎ ও বিদ্বান লোক হতে পারতেন । কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্য রকম ছিল, তাই তিনি বড় কষ্ট পেয়ে মারা যান ।

এ সব কথা মধো ইন্দুর কিছু কিছু মনে ছিল । তাহার পিতার যে অর্থাভাবে জেলে মৃত্যু হয় এবং তাহার মা যে স্বামীর শোকে আত্মহত্যা করেন, এসব কথা তাহার একটু একটু মনে ছিল ।

ইন্দুর এই সব কথা শুনিতো অত্যন্ত ভয় হইতেছিল । সে ভীতভাবে বলিল, এ সব কথা এতকাল পরে আমাকে কেন বলছেন ? আমি কি কোন দোষ করেছি ?

সুরেশবাবু বলিলেন—না মা, তুমি কোন দোষ করনি ; এখন নয়, এর আগেও কখন নয় । এই দুঃখের কথা সঙ্গ একটা আনন্দের কথা আছে সেজন্য তোমাকে বলছি ।

ইন্দু আর কিছু বলিল না । শুধু চাহিয়া রহিল ।

সুরেশবাবু বলিতে লাগিলেন—আমি যা জানতে পেরেছিলাম তা থেকে এইটুকু শুধু বুঝেছিলাম যে, তোমার বাপ কোন বড়লোকের ছেলে । কিন্তু সম্প্রতি আমি জানতে পেরেছি—তিনি খুব বড় জমিদারের একমাত্র ছেলে ছিলেন । তোমার পিতামহ পুনরায় বিবাহ করলেও তাঁর আর কোন সন্তানাদি হয়নি । একই সময়ে তোমার পিতামহের দ্বিতীয়া স্ত্রী ও তোমার প্রপিতামহ মারা যান । তখন তোমার পিতামহই অগাধ সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী । তখনই তিনি তোমাদের সন্ধান করেন ও মেহেরপুরে লোক পাঠান । অন্তঃসন্ধানে বিশেষ কিছু খবর পান না । যা খবর পেয়েছিলেন তাতে শুধু এইটুকু বুঝেছিলেন যে, তোমার ঠাকুরমা, তোমার বাবা, আর তোমার মা তিনজনেই মারা গেছেন—আর তুমি নিরুদ্দেশ ।

লজ্জায় তিনি খুব ভাল করে সন্ধানও করতে পারেন নি ; কারণ তাঁর মত অত বড়লোকের স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূ যেখানে অত কষ্ট পেয়ে মারা গেছেন, সেখানে তাঁর পরিচয় প্রকাশ পেলে বড়ই অমর্যাদা হবে এই ভয়ও তাঁর ছিল। যেটুকু সন্ধান নিয়েছিলেন, তাতে যখন কোন সন্ধান মিললনা, তখন তিনি সমস্ত বিষয়ের ভার তাঁর এক বন্ধুর উপর দিয়ে যান। এক উইল করেন যে তাঁর পৌত্রীর বা তাঁর সন্তানসন্ততির কোন সন্ধান কখন যদি পাওয়া যায়, তাহলে সম্পত্তির অর্দ্ধেক অংশ সে বা তারা পাবে, বাকি অংশ তাঁর নিজের এক বন্ধু পাবেন। যদি পৌত্রীর বা তাঁর সন্তানদের কোন সন্ধান না পাওয়া যায় সমস্ত সম্পত্তিই তাঁর বন্ধুর থাকবে।

এতদিন সে সম্পত্তি সে বন্ধুই ভোগ করছিলেন ; কারণ তাঁর মৃত বন্ধুর পৌত্রীর অর্থাৎ তোমার সম্বন্ধে কোন সংবাদ কয়েকদিন আগে পর্যন্ত তিনি পাননি। সম্পত্তি তিনি তোমার সংবাদ পেয়েছেন এবং তোমাব প্রাপ্য অর্দ্ধেক সম্পত্তি তোমাকে দেবার জন্ত ব্যস্ত হয়েছেন।

কথা শেষ করিয়া সুরেশবাবু ইন্দুর পানে একবার স্থির দৃষ্টিতে চাহিলেন। ইন্দু একটুখানি বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া সুনীলাসুন্দরীর দিকে সরিয়া বসিল। তাহার ভীতভাব দেখিয়া সুনীলাসুন্দরী তাহার পাশে স্নেহভরে হাত রাখিলেন।

সুরেশবাবু আবার বলিলেন—তোমার ঠাকুরদাদার সেই বন্ধুকে তুমি দেখেছ—যদিও তাকে তুমি অন্য সম্পর্কে জেনেছ।

ইন্দু সুনীলাসুন্দরীকে জড়াইয়া ধরিয়া ব্যাকুলভাবে সুরেশবাবুর পানে চাহিল। সুরেশবাবু বলিলেন—তিনি আমাদের ছোট বোমার বাপ গণেশবাবু। তুমি তাঁর কাছে গিয়ে জমীদারির ভার গ্রহণ করবে ও তোমার বংশের উপযুক্ত মর্যাদায় থাকবে, সেজন্য তিনি তোমাকে নিয়ে যেতে চান ও তোমার পৈত্রিক বাড়ীতে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান !

ইন্দুর চোখের কোলে কোলে জল ভরিয়া আসিল। ধীরে ধীরে সে জল চক্ষু ছাপাইয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া ঝরিতে লাগিল। সজলনেত্রে ইন্দু বলিল—“জ্যাঠানশাই, নিতান্ত আশ্রয়হীন হয়েই আমি আপনার কাছে আশ্রয় পেয়েছিলাম। সেই থেকে কন্টার আদরে আমি আপনাদের কাছে আছি। আমার মা বাবা বেঁচে থাকলেও এর চেয়ে আদরে আমাকে তাঁরা রাখতে পারতেন না। এখন আমি সম্পত্তি বা অর্থের জন্ত কোন দেশে, কোন জমীদারের অট্টালিকায় যেতে চাইব? আমার এ আশ্রয় থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।”

সুশীলাসুন্দরীর চক্ষুও সজল হইয়া আসিল। তিনি স্নেহে ইন্দুর চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিলেন—এর জন্ত কারা কেন মা? তুমি আমাদের শান্তির চেয়ে তো কম নও মা। বিষয় সম্পত্তি পেয়েছ এ তো আনন্দের কথা। যদি সন্ধ্যায় করতে চাও অর্থের তুল্য বন্ধু অতি অল্পই আছে। সেখানে তোমার যাবার ইচ্ছা না থাকলে আমরা যেতে দেব কেন! স্বরেশবাবুর চক্ষুও ছলছল করিয়া আসিল। তিনি সুশীলাসুন্দরীর কাছে ইন্দুকে রাখিয়া সেখান হইতে উঠিয়া আসিলেন।

খানিকক্ষণ কাঁদিয়া ইন্দু তবে শান্ত হইল।

কোথায় যে তাহার গভীর ব্যথা, কেন যে তাহার চোখে জল তাহার খানিকটা তিনি জানিলেও আপন মনে তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

সাকুলার রোডের উপর একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা; সম্মুখে স্বল্পোচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত অনেকখানি স্থান; তাহাতে নানা জাতীয় ফুল ও চিরসবুজ গাছের সারি, মাঝে মাঝে সুনির্বাচিত স্থানে সুরচিত কুঞ্জ, মাঝখানের রক্তবর্ণ পথ গৃহস্থামীর সৌন্দর্য্য জ্ঞান ও সুব্যবস্থার পরিচয় দিতেছে।

কলিকাতার অধিকাংশ লোকেই জানে, এই অট্টালিকা দেশভক্তত্যাগী মহাত্মা বুদ্ধদেবের পুত্র দেশহিতরত বিখ্যাত ব্যারিষ্টার গৌরান্দ্র দেবের। সেদিন ছুটি। সকাল হইতে বাড়ীটিতে ভিড় শুরু হইয়াছে। শীতের প্রভাত মাত্র ৭টা বাজিয়াছে। যে কক্ষে ফরাস পাতা থাকে ছুটির দিন বলিয়া গৌরান্দ্র সেই কক্ষে বসিয়া আছেন। বাঁহারা আসিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গে হাশ্বমুখে কথাবার্তা কহিতেছেন।

এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে আসিতে দেখিয়া গৌরান্দ্র উঠিয়া নমস্কারপূর্ব্বক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন—“আসুন, অনেকদিন আসেন নি এদিকে।”

ভদ্রলোক প্রতি নমস্কার করিয়া উপবিষ্ট হইলেন ও বলিলেন—“আজকাল আপনার দয়ায় সময় একটু কম পাচ্ছি—দয়া করে অপরাধ নেবেন না।”

গৌরান্দ্র হাশ্বমুখে বলিলেন—নানা, তাতে হয়েছে কি? আর কিছু কষ্ট বা অসুবিধা নেই তো?

আজ্ঞে না। বেশ চলে যাচ্ছে। আপনি আমার উপর সদয়, শুধু এইটুকু প্রকাশ পাওয়ার আমার সঙ্গীত বিদ্যালয়ের নাম বেড়ে গেছে। ছাত্রের অভাব হচ্ছেনা। তবু আপনার নিষেধ আছে বলে—আপনার কাছে রুত্তি পাই, এ কথা কাউকে বলিনি। সবই আপনার দয়া।

সবই ভগবানের দয়া বলুন। তিনিই আপনাকে নেবার মত শক্তি ও গুণ দিয়েছেন তাই পাচ্ছেন। এ মাসের দক্ষিণাটা পেয়েছেন তো ?

আজ্ঞে হাঁ। আপনার আদেশে এখানে এসে তো কখন অপেক্ষা করতে হয় না। আসবা মাত্র বিদায়। আপনার অসীম দয়া।

দয়া—এ কথা আপনি আর বলবেন না। আমি তো আপনাকে সাহায্য করি না। সঙ্গীত একটা এত বড় বিদ্যা আমাদের দেশে নষ্ট হতে বসেছে—সেই সঙ্গীত যাতে রক্ষা পায়—আপনাদের নিজের সম্পত্তি যাতে বাঁচাতে পারি, সেজন্য বৎসামান্য চেষ্টা করি। আপনিও সঙ্গীতের উদ্ধার ও উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন, আমিও তাই করি।

আচ্ছা, আমি আর ওসব কথা বলতে চাইনে, শুধু এই বলি শ্রীভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন। এখন উঠি; আপনার বেশী সময় আমি একা নষ্ট করলে অপরের প্রতি অবিচার হবে।

সঙ্গীত শিক্ষক চলিয়া গেলে একটি প্রিয়দর্শন দীর্ঘাকৃতি যুবক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার বেশ—ধূতি ও উড়ানি—সুপরিষ্কৃত কিন্তু সাবান দিয়া কাঁচা তাহা লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়। কিন্তু উড়ানিখানি গায়ে এমনভাবে জড়ানো যাহাতে তাহার দীর্ঘ গোরবর্ণ দেহকে একটা বিশিষ্টতা দিয়াছে।

গোরাঙ্গ তাহাকে হাশ্বমুখে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। বলিলেন—
“আপনার বইখানি বড় সুন্দর হয়েছে। কালই আমি সেখানি ছাপাবার ব্যবস্থা করে এসেছি। আপনার রচনা ভঙ্গী বড় মনোরম। বলেঙ্গু ঠাকুরের কবিত্বপূর্ণ গদ্যের পর এমন লেখা আর দেখা যায়নি।

যুবক একটু সংকোচের সহিত বলিল—আমার প্রার্থনা ছিল বইখানি সম্বন্ধ বিক্রয় করে কিছু অর্থ সংগ্রহ করা আমার আর্থিক অবস্থাও খাবার—

গৌরান্দ্র বলিলেন—আপনার বইখানির সমস্ত বিক্রি করলে ভবিষ্যতে আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হ'ত। সেজন্য সে ব্যবস্থা করলাম না। বই ছাপাবার ব্যবস্থা আমি করে দিইছি। হিসাব ওঁরা আপনার নানেই রাখবেন। বৎসরে দু'বার হিসাব করে আপনার প্রাপ্য টাকা ওঁরা ঠিক নিয়মিতভাবে পাঠিয়ে দেবেন। আর আপাততঃ আপনি যাবার সময় একবার মৃণালের সঙ্গে দেখা করে যাবেন আর এই চিঠিখানা দেবেন।

মৃণাল গৌরান্দ্রের একজন কর্মচারী। তাহার কাজ হইতেছে প্রভুর নির্দেশমত সকলকে নির্দিষ্ট দিনে অর্থ সাহায্য করা।

যুবক উঠিয়া পাশের ঘরে গেল। মৃণাল চিঠিখানি পড়িয়া প্রভুর নির্দেশমত অর্থ তাহার হাতে দিল।

যুবকের মুখে চোখে বিষ্ময় ও প্রফুল্লতা ফুটিয়া উঠিল। কোঁচার খুঁটে নোট কয়খানি বাঁধিয়া সে এই ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল—জগতে এমন লোকও আছে।

কিছুক্ষণ পরেই একটি অষ্টাদশ বর্ষীয় বালক প্রণাম করিয়া গৌরান্দ্রের পায়ের কাছে বসিল।

গৌরান্দ্র প্রসন্নমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—কিহে, সব খবর ভালতো ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তোমার বাবা বেশ সেরেছেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার আশীর্ব্বাদে।

আমার আশীর্ব্বাদে বুঝি রোগ সারে ? তোমাকেও 'আশীর্ব্বাদ' রোগে ধরেছে ?

আপনার আশীর্ব্বাদের শক্তি আছে—এ আমি খুব বিশ্বাস করি।

আচ্ছা, বেশ কর ; তুমি খুব জ্ঞানী।

হ্যাঁ ভাল কথা,—গেল মাসে শুন্‌লাম তুমি টাকা নিয়ে যাওনি।

আপনার দয়ায় আমার সে অসুবিধা কেটে গেছে। স্কারশিপের টাকাতে আমার খরচা চলে যায়। একটা টিউশনি পেয়েছি—সে টাকাটা বাড়ী পাঠাই; আর বাবাও কাজ করতে শুরু করেছেন। ও টাকায় আবার আর একজনকে সাহায্য করতে পারবেন।

আচ্ছা তাই হবে। বিএ, পড়ার সময়টা পর্যন্ত পাও তো। এবারটা টিউশনি বোরোনা। যদি কিছু বাঁচে জমাও।

বে আঙ্কে তাই করব।

আচ্ছা বেশ, টাকা নিয়ে যাও। মাঝে মাঝে খবর নিতে এস।

আঙ্কে আসব। ছেলে পাড়য়ে তেমন সময় পেতাম না; তাই ইদানীং আসতে পারতাম না। আজ তাহলে উঠি।

হ্যাঁ, এস। হয়েছে—হয়েছে—আর ভূমিষ্ঠ হতে হবে না।

ছেলেটি তবু ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া তবে ছাড়িল।

এইরূপে আরও জনকতক আসিয়া সাহায্য লইয়া চলিয়া গেল।

ঘড়িতে ১১টা বাজিল।

গোরাঙ্গ একটি বালক ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন—একবার ভিতর থেকে জেনে এস, তোমাদের মায়ের কাজ শেষ হয়েছে কিনা।

একটু পরে সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—মার কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। এক বুড়িমা কেবল তাঁর কাছে বসে আছেন। তিনিও পেয়েছেন—উঠবেন। মা বলে দিলেন আপনি ভেতরে যান্।

গোরাঙ্গ আর একটু অপেক্ষা করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

হুস্থ মেয়েরা বাহাদের পুরুষ অভিভাবক নাই, তাহারা শান্তির কাছে আসিত। শান্তি ততক্ষণে কাজ শেষ করিয়া স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিত।

গৌরান্ধ বলিলেন—আজ আবার গোলদীঘিতে সভা আছে। ঠিক তিনটার বা'র হতে হবে।

শান্তি বলিল—তা মনে আছে। আচ্ছা দাদা যাবেন না ?

না যেতে পারে—মণী আজকাল অন্য আদর্শে চলছে যে। অসহযোগের সভাতেই সে যায়, আর গান গায়। তার এক একটা গানে আজকাল ৫০টা বক্তৃতার কাজ হচ্ছে।

এবার দাদা যেখানে গান গাইবেন আমাকে একবার নিয়ে যেও তো।

বেশ—তাই যাব।

তারপর আহালাদি শেষ করিয়া দুইজনে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বাহির হইলেন। যাইবার সময় পিতামাতার তৈলচিত্রের দিকে চাহিয়া প্রণাম করিতে কেহই ভুলিলেন না।

৩৯

এক বৎসরের মধ্যে অসহযোগ প্রবল হইয়া উঠিল। বাংলাদেশে যেমন সকল বিষয়ের প্রারম্ভে মহাসমারোহ হয়, এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না।

মণীন্দ্র অসহযোগে মাতিয়া উঠিল বি-এল অর্ধপথে ছাড়িয়া দিল ও বিনা বেতনে জাতীয় কলেজের প্রফেসরের কাজ লইল। গৃহে পতিপ্রাণা স্ত্রী, ১টি পুত্র আসিয়া গৃহ আলো করিয়াছে, পরম স্নেহময় ভ্রাতা, দেবতার মত পিতামাতা ;—তবু সে সব ছাড়িয়া দেশের কাজে মগ্ন হইয়া আছে। যুবকসঙ্ঘের সে সম্পাদক, সেবা-সমিতির সে সভাপতি ও শ্রেষ্ঠ সেবক ; বালক ও যুবকদের শরীর ও মন যাহাতে উচ্চ হয় তাহাই মণীন্দ্রের দিবা-রাত্রি চিন্তা। ইহার উপর সভাসমিতি তো লাগিয়াই আছে যেখানে মণীন্দ্রের একটি গান নহিলে চলিবেই না।

সুরেশবাবুর নিকট উপর হইতে গোপনীয় পত্র আসিল, তিনি যেন পুত্রকে সাম্নাইয়া লন নচেৎ—

সুরেশবাবু উত্তরে জানাইলেন—পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক, তাঁহার অধীন নহে। পুত্রের স্বাধীন ইচ্ছার উপর হস্তক্ষেপ করিবার আধিকার তাঁহার আর নাই।

ব্যাপার তখন আর ইহার বেশী অগ্রসর হইতে পারিল না।

বেঙ্গল আউট্‌রাম স্যাক্ট হঠাৎ একদিন আধকাংশ লোকের অমতেও বাহির হইয়া গেল। শ্রবীণ ও বৃদ্ধের বক্ষে ব্যথা ও দুশ্চিন্তার ভার পুঞ্জীভূত হইয়া পড়িল। তরুণের চক্ষে অগ্নি জ্বলিল।

সেদিন অপরাহ্নের মহতী সন্ধ্যা কলিকাতাবাসীর মনে চিরজাগরুক হইয়া রাতবে। নগরের সমস্ত তরুণের দল সেদিন মণীন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া ছিল। ধীরে ধীরে বালক, যুবক, শ্রোত, বৃদ্ধ অনেকে আসিয়া যোগ দিল। কত খ্যাতিনামা বক্তা বক্তৃতা দিলেন, সকলের হৃদয়ে সাহস দিবার চেষ্টা করিলেন।

জাহ্নবার পশ্চিমপ্রান্তে রক্তপূর্য্য তলিয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মণীন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সকলেরই মনে হইল, সে যেন কোথায় সত্য দর্শন করিয়াছে—তাই সত্যের বাস্তবতা ও বাণী তাহার চক্ষে ও কণ্ঠে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মণীন্দ্র গাহিল—

নিশিদিন ভরসা রাখিস্

ওরে মন হবেই তবে।

যদি পণ করে থাকিস্

সে পণ তোমার হবেই হবে।

ওরে মন হবেই তবে ॥

পাষণ সমান আছে পড়ে'
 প্রাণ পেয়ে সে উঠবে ওরে,
 আছে যারা বোবার মতন,
 তারাও কথা কবেই কবে ।
 ওরে মন হবেই হবে :

সময় হোলো, সময় হোলো,
 যে যার আপন বোঝা তোলো,
 দুঃখ যদি মাথায় ধারিস্
 সে দুঃখ তোর সবেই সবে । .
 ওরে মন হবেই হবে ।

ঘণ্টা যখন উঠবে বেজে
 দেখবি সবাই আসবে সেজে,
 একসাথে সব যাত্রী যত
 একই রাস্তা লবেই লবে ।
 ওরে মন হবেই হবে ॥

গানের প্রতি অক্ষর ও প্রতি সুরকণা হইতে যেন সুধা ঝরিতে লাগিল ;
 সেই বিশাল জনতা মন্ত্রমুগ্ধবৎ সুধাপান করিতে করিতে গায়কের পানে
 চাহিয়া রহিল । শত শত বক্তৃতায় যাহা না হইত, একটি গানে তাহার
 অপেক্ষা লক্ষগুণে কাজ করিয়া গেল । গানের সুর যেন সবারই কানে
 কানে মধুর সুরে বলিয়া গেল—হতাশ হইও না, পণ স্থির রাখিও, পূর্ণ
 হইবে । নিজের কাজটুকু সুধু করিয়া যাও—সবারি কাজ আপনি গড়িয়া
 উঠিবে । কাহাকেও অলস দেখিলে হতাশ হইও না ; সময় যখন আসিবে,

দেখিও সবাই আপন আপন পথ লইয়াছে। তুমি সুধু আপনার পথ হির রাখিও ; মনের বল ও হৃদয়ের -রসা হারাইও না।

বক্তাদের একপার্শ্বে মহিলাদের আসন ছিল। অনেক মহিলাই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইন্দু, কমলা ও উষা মণীন্দ্রের সঙ্গে আসিয়াছিল। শান্তি আসিয়াছিল গোরাক্ষের সঙ্গে। সুরেশবাবু ও সুশীলাসুন্দরী ইচ্ছা করিয়াই আসেন নাই। গানের সুরে সবারই চোখে জল আসিয়াছিল।

গান থামিয়া গেলে এক এক করিয়া যুবক, প্রোঢ় ও মহিলারা উঠিয়া অসহযোগের জন্ত প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিল। মহিলাদের মধ্য হইতে ইন্দু সর্বপ্রথমে উঠিয়া প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিল। তারপর আরও কয়েকটি মহিলা উঠিলেন। জনতা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

৫০

সেদিন ছুটি। মণীন্দ্রের অত্যধিক কাজ, তরুণ সমিতির উৎসাহ বন্ধনের জন্ত বহু পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা হইয়াছে ; কেহ কুস্তির জন্ত, কেহ লাঠি খেলার জন্ত, কেহ তীর ছোড়ার জন্ত, কেহ দোড়িয়া, কেহবা সাতার কাটিয়া পুরস্কার পাইতে লাগিল। এখানেই বেলা ১০টা বাজিয়া গেল। সেখান হইতে উঠিয়া মণীন্দ্র সেবাশ্রমে গেল। সেবাশ্রমে দেখা শোনা করিতে বেলা ১২টা বাজিয়া গেল। তখন মণীন্দ্র বাড়ীর উদ্দেশে বাহির হইল।

বাড়ীতে সকলে মণীন্দ্রের অপেক্ষার তখনও বসিয়া। সুশীলাসুন্দরী এক একবার বাহিরের দিকে চাহিতেছিলেন। একবার বলিলেন—আজ যেন মণীর একটু বেশী দেবী হচ্ছে না ?

ফণী বলিল—না মা, তুমি অনেকক্ষণ এই কথাই ভাবছিলে, তাই এমন মনে হচ্ছে। এই বারোটা বাজল মণী এল বলে।’

সুশীলাসুন্দরীর একটি দার্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। সুরেশবাবু স্ত্রীর পানে ফিরিয়া বলিলেন—আজ যেন তোমাকে বড় কাতর দেখাচ্ছ।

সুশীলাসুন্দরীর চোখের কোলে কোলে তখন জল ছাপাইয়া আসিয়াছে। কোনমতে অশ্রু গোপন করিয়া তিনি বলিলেন, আজ মণীর জন্ম আমার মন বড় কাঁদছে। কেবল মন কু গাইছে। ইচ্ছা করছে কিছুকাল তাকে কোথাও যেতে না দিয়ে আমার কোলের কাছে বসিয়ে রাখি।

ফণী বলিল, তাই তাকে বোলো মা—তোমার কথা কিছুতে সে অমান্য করবে না।

সুশীলাসুন্দরী। তা তো জানি, বাবা। কিন্তু কি করে তাকে বারণ করি; সে তো কোন অন্তায় করছে না। আমার নিষেধে সে ঘরে বসে থাকবে, আর মন তার দেশের কাজের জন্ম ছটফট করবে—তাতেও তো আমি সোয়াস্তি পাব না।

সুরেশবাবু। তুমি তো সত্য চিরদিনই সহ্য করতে জান। মণী বে কাজ নিয়েছে তাতে তো পদে পদে বিপদ। সব জেনে শুনে এত বিচলিত হওয়া তোমার ঠিক হয় না।

সুশীলা। কি করব বল—এক একবার মন বড়ই কাতর হয়ে পড়ে। একি ছোট বোমা—তুমি কাঁদছ কেন মা? তোমার মত ভাগ্য কার হয়?

কমলা কিছু বলিতে পারিল না। কাঁদিয়া শাশুড়ীর কোলে মুখ লুকাইল।

এমন সময় মণী আসিয়া পৌঁছিল। সকলের মুখে চিন্তার ভাব

দেখিয়া মণীন্দ্র লজ্জিত হইয়া কহিল, আমার আজ একটু দেৱী হয়ে গেছে মা ।

সুশীলাসুন্দরী মুখে প্রফুল্লতা আনিয়া কহিলেন, আজ আবার কিছু না খেয়ে কোন্ সকালে বেরিয়েছিলি বল দেখি । একটু জিরিয়ে শীগগির নেয়ে নে । আমি ভাত দেবার ব্যবস্থা করিগে । সুশীলাসুন্দরী উঠিলেন । উষা, কমলা ও ইন্দু সঙ্গে সঙ্গে গেল ।

মণীন্দ্র শীঘ্র শীঘ্র স্থান সারিয়া আসিল । পিতার সঙ্গে দুই ভাই থাইতে বসিল ।

সুশীলাসুন্দরী নিজে আজ পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন । উষা ও কমলা অনুরোধ করিতে সুশীলাসুন্দরী বলিলেন—“তোমরা তো রোজই কর মা । আজকে আমিই করি ।”

আহারান্তে সুরেশবাবু আপনার কক্ষে বিশ্রাম করিতে গেলেন । দুই ভাই বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল ।

বাহিরে একবার মোটারের হর্ণ বাজিল । একটি ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, একজন পুলিশের বাবু এসেছেন । মণীন্দ্র, মণীন্দ্রের মুখের পানে চাহিল । মণীন্দ্র ভৃত্যের পানে চাহিয়া বলিল—“তাকে এখানে নিয়ে এস ।”

উচ্চপদস্থ পুলিশের পরিচ্ছদে সজ্জিত একজন বাঙালী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, মণীন্দ্র তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া একখানি আসনে বসাইল ।

মণীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—আপনার কি প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

পুলিশ কর্মচারী বলিলেন—আমার দোষ গ্রহণ করবেন না—মণীন্দ্র বাবুর নামে একখানি ওয়ারেন্ট আছে । বলিয়া পকেট হইতে ওয়ারেন্ট বাহির করিয়া মণীন্দ্রকে দেখাইল ।

মণীন্দ্র কাগজখানি একবার পাড়য়া কর্মচারীর হাতে ফেরৎ দিয়া
নিবিকার ভাবে বলিল—“এক্ষণি যেতে হবে ?”

কর্মচারী বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, সব প্রস্তুত ।

মণীন্দ্র বলিল—আমার মা এই মাত্র খেতে বসেছেন । তিনি খেয়ে
উঠতে আধঘণ্টাটুকু দেবী হতে পারে । সেই টুকু অপেক্ষা করতে পারবেন
না ?

কর্মচারী একটু বিচলিত হইয়া বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারব ।
আমি একঘণ্টা বাহরে গিয়ে অপেক্ষা করছি ; আপনি প্রস্তুত হয়ে নিন ।

কর্মচারী উঠিতে উত্তত হইলেন । মণীন্দ্র বলিল, আপনি এখানেই
বসুন—তাতে কোন বাধা আছে ?

কর্মচারী বলিলেন—বাধা কিছু বিশেষ নেই ; তবে আমাদের কর্তব্য
অপ্রীতিকর—আমাদের মত জীবের বাইরে থাকাই ভাল ।

মণীন্দ্র বলিল—না, না,—আপনার কি দোষ । আপনি যে আমাকে
একঘণ্টা সময় দিয়েছেন—এতে আপনার দয়ার পরিচয় পেয়েছি ।

মণীন্দ্র বলিল—একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি ?

কর্মচারী উত্তর দিল—করুন ।

মণীন্দ্রকে কেন ধরা হয়েছে, এ সম্বন্ধে আপনি কিছু বলতে পারেন ?

আপনি বিজ্ঞ, সব তো জানেন । বেঙ্গল আডভান্স এন্ট্ অফিসারে
এঁকে ধরা হচ্ছে ।

বিচার হবেনা ?

আপাততঃ কোনখানে আবদ্ধ রাখা হবে ।

কোথায় ?

আপাততঃ আসাম ।

বাহিরে না—জেলে ?

জ্বলে ?

তিন জনে নির্ঝাক্ হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন ।

মণীন্দ্র বাবল, দাদা তুমি যেন মুষ্ড়ে যেওনা ; সবাইকে দেখবার ভার এখন তোমার । একবার তরুণ-সামিতিতে গিয়ে শুধু বলে এস—আমি চললাম, তারা যেন নিজেদের কত্তবা করে যায় । আর কোথায় গিয়ে পড়তে হবে তার তো ঠিক নেই খান কয়েক ভাল বই তুমি আনার জন্ত বেছে রাখ । আমি তৎক্ষণ বাড়ীর ভেতর থেকে আসি একবার ।

মণীন্দ্র উষ্ণা ভিতরে গেল । ফণীন্দ্র বই গুছাইতে লাগিল ।

সুরেশ বাবুর কাছে সুনীলাসুন্দরী মণীন্দ্রের খোকাকে কোলে করিয়া সবে আসিয়া বসিয়াছেন । উষা ও কমলা মেঝের উপর বসিয়া আছে । ইন্দু বিবেকানন্দ স্থানীর একখানি বহি পড়িতেছে—সবাই শুনিতোছে । ফণীন্দ্রের বাবুক পুত্র খাতা পেন্দিল লইয়া অঙ্ক কসিতেছিল ; সেও মাঝে মাঝে অঙ্ক কনা বন্ধ রাখিয়া ইন্দুর পড়া সবিস্ময়ে শুনিতোছে ।

এমন সময়ে মণীন্দ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল । সুনীলাসুন্দরী ভীত ভাবে পুত্রের পানে চাহিলেন । প্রভাত হইতে তাঁহার হৃদয় পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় ব্যাকুল ছিল ।

মণীন্দ্র ধীরে ধীরে মায়ের পায়ে কাছ বসিয়া তাঁহার পায়ে উপর ক্ষণকালের জন্ত আপনার মাথা রাখিল । পরে মাথা উঠাইয়া চাহিতে সুনীলাসুন্দরী স্নেহভরে পুত্রের মাথায় হাত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—
“কি বাবা ?”

মণীন্দ্র বলিল, মা তুমি দুঃখ পেওনা—এবার তোমাদের কিছুদিন ছেড়ে যেতে হবে ।

কেন বাবা, কি হয়েছে বাবা ?

বলিয়া সুনীলা সুনন্দরী ব্যাকুলভাবে পুত্রকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলেন ।

মণীন্দ্রের চোখে এবার জল আসিল । চক্ষু মুছিয়া—মণীন্দ্র বলিল—
মা, তোমার বলেই আমার বল । তুমি চোখের জল ফেললে আমি যে
একেবারে দুর্বল হয়ে যাব । নূতন আইনে আমাকে বন্দী করে রাখা
হবে, তাই পুলিশের এসিষ্ট্যান্ট কমিশনার লোক জন সঙ্গে এসেছেন ।
এ সময়ে তুমি ভেঙ্গে পোড়োনা মা ।

পরে পিতার পানে চাহিয়া বলিল—বাবা, আপনি মাকে বলুন একবার ।

সুরেশ বাবু সুনীলাসুনন্দরীর পানে চাহিয়া বলিলেন তোমার ছেলে তো
কোন হীন কাজ করে জেলে যাচ্ছেনা, যে তার জন্ত তুমি চোখের
জল ফেলবে । তোমার ছেলে তো শুধু তোমার আমার গৌরব নয়—
সমস্ত ভারতবর্ষের গৌরব । বুকে বল দাধ, ছেলেকে—আশীর্বাদ কর ।

বলিয়া সুরেশ বাবু ক্ষণেকের জন্ত পুত্রের মাথায় হাত রাখিলেন । মনে
মনে তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন ।

সুনীলাসুনন্দরী চক্ষু মুছিয়া পুত্রের মাথায় পরম স্নেহভরে হাত রাখিয়া
বলিলেন—চিরজীবি হও । আবার হাসিমুখে শীঘ্র ফিরে এস । আবার
দেশের কাজ কর ।

মণীন্দ্র তখন উঠিয়া পিতার চরণে মাথা নত করিল । সুরেশ বাবু
আবার নীরবে পুত্রের মাথায় হাত রাখিলেন ।

মণীন্দ্র ধীরে ধীরে বলিল—বাবা তাহলে এখন যাই ।

সুরেশ বাবু চাহিয়া দেখিলেন ইন্দু, উষা, কমলার সবারই চোখে জল ।
বলিলেন—মা তোমারা একটু আপন আপন ঘরে যাও মা— । মণি কোন
খানে যাবার আগে তোমাদের সকলের সঙ্গে দেখা করে তবে যাবেন ।

তাহারা উঠিয়া ; চোক্ষু মুদিয়া তখন কেহই কুল পাইতেছিল মা ।

সুরেশ বাবু তখন পুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথায় নিয়ে যাবে বা কতদিন রাখবে সে সব কিছু জানতে পারনি বোধ হয় ?

মণীন্দ্র বাবু—ঠান অতি সজ্জন । বললেন নতুন অডিটরস এষ্ট অনুসারে ধরা হচ্ছে—সম্ভবতঃ বিচার হবে না এবং জেলেই রাখবে—তবে সময়ের আভাস কিছু দিতে পারেন না ।

সুরেশ বাবু তখন বলিলেন—সকলের ঘরে গিয়ে একবার দেখা করে ভূমি এস । আমর নাচে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি ।

মণীন্দ্র মাতা পিতাকে সে কক্ষে রাখিয়া বাহিরে আসিল । উষার কক্ষে আসিয়া দেখিল, উষা দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া চক্ষু মুছিতেছে ।

মণীন্দ্র উষাকে প্রশ্নাম করিয়া কহিল—বৌদাদি, এবার মায়ের ভার তোমার । ফিরে এসে যেন মাকে দেখতে পাই ।

উষা কাঁদতে কাঁদতে কহিল, তোমার অভাব মায়ের কি করে দূর করব ঠাকুরপো । তবে আমার বা সাধ্য তা কোরবো ।

মণীন্দ্র ধীরে ধীরে আপনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল । কমলা কক্ষ-মধ্যে চাহিয়া নাচে নামিয়া পথের দিকে চাহিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল । স্বামীকে দেখিয়া একটু পাশের দিকে সরিয়া আসিল ।

মণীন্দ্র কমলার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল । তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া, তাহার রোদনারক্ত মুখের পানে চাহিয়া বলিল—চুপ কর, কমলা ! কাতর হোয়োনা । বাপের মায়ের ভার—থোকার ভার এখন তোমায় নিতে হবে । আমি আবার ফিরে আসব ।

কমলা আর আপনাকে সংবরণ করিতে পারিলনা । স্বামীর বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল, তোমার কাছে থেকে যে এখনও আমার একটুও আশ মেটেনি । কেমন করে আমি তোমায় ছেড়ে থাকব । আমার বুক যে ফেটে যাচ্ছে ।

মণীন্দ্র তাহার অশ্রু মুছাইয়া বলিল—তুমি স্থির হও কমলা ।
তোমাকে এভাবে দেখে গেলে যতদিন আমি জেলে থাকব, ততদিন
সর্বক্ষণ আমার মনে হবে তুমি কাঁদচ ।

কমলা অশ্রু মুছিয়া মুখে শাস্ত ভাব আনিতে চেষ্টা করিল ; পরে
স্বামীকে গমনোচ্ছত দেখিয়া ভূনিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল । স্বামী চক্ষুর
অস্তরালে যাইতেই কমলা সেই কক্ষতলে লুটাইয়া পড়িল ।

সব শেষে ইন্দুর কক্ষ । ইন্দু দুয়ার হইতে সামান্য দূরে সিঁড়ির
কাছাকাছি জায়গাটায় দাঁড়াইয়া ছিল । মণীন্দ্র ইন্দুকে দেখিয়া বলিল—
“ইন্দু, আমি চললাম ; কমলাকে তুমি দেখ—যতদিন এখানে থাক ।”

ইন্দু শাস্তভাবে বলিল, আমি অনেকদিন এখানে থাকব কখনও ;
তোমরা তাড়াতে পারবে না । কমলাকে আমি দিন রাত্রি দেখব—তাকে
অন্তমনস্ক রাখব । তুমি আমাকে যা আদেশ করে যাবে, তা আমি
অক্ষরে অক্ষরে পালন করব । তুমি সে সম্বন্ধে নিশ্চিত থেক ।

‘তুমি চিরস্থখিনী হও’ বলিয়া ইন্দুকে আশীর্বাদ করিয়া মণীন্দ্র অগ্রসর
হইতে ইন্দু বলিল—একটু দাঁড়াও, কোন দিন তোমায় প্রণাম করিনি—
আজ একটা প্রণাম করে নিই ।

বলিয়া গলে অঞ্চল দিয়া ইন্দু মণীন্দ্রের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া
প্রণাম করিল । পরক্ষণে—মণীন্দ্রের মনে হইল দুখানি কোমল ওষ্ঠ যেন
তাহার পায়ের উপর বুলাইয়া গেল । পরক্ষণে ইন্দু উঠিয়া মুখ ফিরাইয়া
দ্রুতবেগে আপন কক্ষে প্রবেশ করিল ও তৎক্ষণাৎ দুয়ার বন্ধ করিয়া
দিল ।

মণীন্দ্র নীচে নামিয়া দেখিল পুলিশ কর্মচারীর সহিত তাহার পিতা
কথা কহিতেছেন । মণীন্দ্র নিকটে আসিয়া বলিল, একটু বেশী দেবী হয়ে
গেল ; ক্ষমা করবেন । এবার আমি প্রস্তুত ।

পুলিশ কর্মচারী অগ্রসর হইলে মনীন্দ্র শান্তমুখে তাঁহার অহুসরণ করিল।

ফণীন্দ্র ও সুরেশ বাবু সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিলেন।

মনীন্দ্র আর একবার পিতার পায়ে ধুলা লইল; দাদাকে প্রণাম করিয়া হাসিমুখে—তাঁহার পানে চাহিল। পরক্ষণে গাড়ীতে গিয়া উঠিল। পুলিশ কর্মচারী মনীন্দ্রের পাশে উঠিয়া বসিলেন। মোটর শব্দ করিয়া ছাড়িয়া দিল ও মুহূর্তে দৃষ্টি পথের অতীত হইয়া গেল! যেন একটা আর্তনাদের সঙ্গে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস বহিয়া গেল।

৪১

পরদিন প্রভাতে সকলে শুষ্কমুখে একত্র বসিয়া। গোরান্ন ও উষা খবর পাইয়া রাত্রেই আসিয়াছিল। সারারাত্রি একটা দুঃস্বপ্নের মত কাটিয়া গিয়াছে। কাহারও চক্ষে নিদ্রা আসে নাই। সকলেই যথাসাধ্য আপনার দুঃখভার গোপন রাখিতে চেষ্টা করিতেছে; কারণ একের দুঃখ প্রকাশ অপরকে আঘাত করিবে। কেবল সুশীলাসুন্দরী ও কমলার মুখে একরাত্রেই এমন একটা গভীর ছাপ বসিয়া গিয়াছে, যে এই দু'জনের মুখের পানে কেহই চাহিতে পারিতেছিলনা।

সুরেশ বাবুই প্রথমে কথা কহিলেন। বলিলেন, দেখ কাল রাত্রে আমরা যতখানি মুষ্ড়ে গিচ্ছলাম, অতখানি মুষ্ড়ে যাওয়া আমাদের কারও উচিত হয়নি। মণীর ইন্টার্নড হওয়া বা জেলে যাওয়া আমাদের কাছে একটা গোরবের জিনিস। এ পর্যন্ত কোন্ কাজ না সে সগোরবের করেছে বল? তাকে ডেপুটির পদ যোগাড় করে দিতে চাইলাম, সে তা নিলে না। আর আমি যখন এই ডেপুটিগিরি পেয়েছিলাম,—আমার

বোধ হয় তিন রাত্রি ঘুম হয়নি। দেশের জন্ত কি উপযুক্ত ভাবে সে খাটতে শিখেছিল, আর কি অক্লান্ত ভাবে খাটত। সে শুধু এই চেষ্টা নিয়ে থাকত কিসে দেশের সবাই দেহে মনে আত্মায় বড় হয়; আর সে জন্ত তার চেষ্টার অন্ত ছিল না। তার এই চেষ্টার মধ্যে বড়বন্দ, এ সব কিছুই ছিল না। তাকে যারা বন্দী করবে, তাকে যারা নির্ঘাতন করবে, তারা নিজের পরাজয় নিজেই ঘোষণা করবে।

কেহ কোন উত্তর করিল না। কমলা ও সুশীলাসুন্দরী মুখ ফিরাইয়া অশ্রু গোপন করিলেন।

কেবল ইন্দুর চোখে যেন আগুন জ্বলিতে লাগিল। সে যেন কি বলি বলি করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর সে বলিল—“জ্যাঠামশায় এর কি কোন প্রতিকার নেই?”

সুরেশ বাবু। কিসের প্রতিকার তুমি চাইছ মা?

ইন্দু। এই যে বিনাপরাধে ধরে নিয়ে গিয়ে অবিচারে জেলে রেখে দেবে—এর বিরুদ্ধে কি কিছুই বলবার বা করবার নেই?

সুরেশ বাবু। যদি বিচার হ'ত, তাহলে তো চের বলবার ও করবার ছিল। তাহলে কার সাধ্য যে মণীকে জেলে রাখে? কিন্তু এর তো বিচার হবে না মা। যে আইনে এঁদের ধরা হচ্ছে, তাতে যে দেশে যেখানে ইচ্ছা এঁদের রেখে দেওয়া হবে। তার বিরুদ্ধে কিছু বললে গ্রাহ্য হবে না।

ইন্দু। কত দিন রাখবে।

সুরেশ বাবু। যারা রাখবে তাদের ইচ্ছা।

ইন্দু। তাহলে কি একেবারে চুপ বসে থাকতে হবে আমাদের।

সুরেশ বাবু। না মা। তোমরা ক্ষুব্ধ হোয়োনা, আজ থেকেই আমরা চেষ্টা করছি, যাতে সে মুক্তি পায়। গৌরাস্ত ও ফণী কাল রাত থেকে সেই চেষ্টাতেই ঘুরচে।

ইন্দু। আমি আজ থেকে আর কলেজে যাব না।

সুরেশবাবু। কেন মা ? তোমার পড়াতে এত আগ্রহ ! আর ক'মাস পরেই পরীক্ষা ; এটা শেষ করলে হ'ত না মা ?

ইন্দু। আমি কমলাকে দেখব, জ্যাঠামশায়।

আমি না থাকলে কমলার বড় একা বোধ হবে। পড়ার চেয়ে আমি এতে বেশী সুখে থাকব। আপনি দয়া করে অনুমতি দিন।

ইন্দুর মুখ বলিতেছিল, আমি কমলাকে দেখিব, হৃদয় বলিতেছিল, আর আরও কিছু।

ইন্দু। অনুমতি পাইল।

সুরেশ বাবু পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, ফণী এবার তোমাদের একটু ব্যয় সংকোচ করতে হবে, আমার আর চাকরী করবার ক্ষমতা নাই ; অথচ পেনসনের টাকা খাওয়াও আমার কঠিন হবে। আমি সে জন্তু আজ পদত্যাগ পত্র লিখে পাঠাচ্ছি।

বলিয়া পকেট হইতে বাহির করিয়া এক খানি লেখা চিঠি ফণীর হাতে দিলেন। ফণী পত্র খানি লইয়া সকলকে শুনাইয়া পড়িল। তাহাতে লেখা ছিল যে, তিনি একাদিক্রমে ত্রিশ বৎসর কাল আপনার জ্ঞান বুদ্ধি ও ক্ষমতা মত গভর্ণমেন্টের সেবা করিয়া আসিয়াছেন। অধুনা তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রাজদ্রোহ অভিযোগে ধৃত হওয়ায়, তিনি হৃদয়ে এমন আঘাত পাইয়াছেন যে, ইহার পর পূর্বের মত আন্তরিকতার সহিত কার্য করা তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব হইবে না, তাঁহার পুত্র মণীন্দ্র নির্মল ও নিষ্পাপ, ইহা তিনি নিঃসন্দেহে অবগত আছেন। দেশের তরুণ ও যুবকগণের দেহ, মন ও আত্মাকে সবল উন্নত, ও পবিত্র করিবার তাঁহার পুত্রের যে প্রচেষ্টা ছিল, তাহাকে তিনি পরম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। ত্রিশ বৎসর ব্যাপি রাজ সেবার ফলে তিনি

তঁাহার বৃদ্ধ বয়সে গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে এই যে অন্তায় ও কঠিন ব্যবহার পাইয়াছেন, তাহারই নম্র প্রতিবাদ স্বরূপ আজ হইতে তিনি পদত্যাগ করিলেন। তঁাহার বিনীত প্রার্থনা যে, তঁাহার এই পদত্যাগ পত্র যেন আজিকার তারিখ হইতে গৃহীত হয়। যদি তাহাতে বিলম্ব ঘটে, তাহা হইলে ইহা গৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত যেন তঁাহাকে বিনা বেতনে অবকাশ দেওয়া হয়।

পদত্যাগ পত্র শুনিয়া সকলের চক্ষুই সজল হইয়া উঠিল। এইবার ইন্দুর চোখেও জল আসিল।

ইন্দু সেদিন আহারাদির পর সুশীলাসুন্দরীর অনুমতি পাইয়া গাড়ী লইয়া একবার বাহিরে গেল। অপরাহ্নে ফিরিয়া আসিয়া ইন্দু একতাড়া নোট সুরেশবাবুর পায়ের কাছে রাখিয়া সাক্ষনেত্রে বলিল—“জ্যাঠামশায় আমার টাকা আছে, আপনিই আমাকে বলেছিলেন। আজ আমি দাদামশায়ের কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে এসেছি। ছোটদার উদ্ধারের জন্য আপনি দয়া করে এই টাকা গ্রহণ করুন।”

সবারই চোখে জল আসিল।

সুরেশবাবুও বিচলিত হইলেন। তিনি আপনাকে সম্বরণ করিয়া শান্তকণ্ঠে বলিলেন—মা, আমি তোমার টাকা নিলাম। ফণী, ইন্দুর নামে ব্যাঙ্কে যে হিসাব আছে, তাতে এ টাকা আপাততঃ জমা রেখে দাও। তুমি ক্ষুদ্র হোয়োনা মা—দরকার হলেই আমি তোমার এ টাকা কাজে লাগাব।

সুশীলাসুন্দরী এ শোক সামলাইতে পারিলেন না। কয়েকমাসের মধ্যেই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন।

সুরেশবাবু, ফণীন্দ্র, মণীন্দ্রের স্বশুর গণেশবাবু বহু অর্থব্যয় করিয়াও মণীন্দ্রের মুক্তির ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। সুশীলাসুন্দরী হতাশ হইয়া শয্যাগত হইয়া পড়িলেন। ক্রমে তাঁহার জীবনের আশা কমিয়া আসিল।

গভর্নমেন্টের কাছে আবেদন করা হইল, মণীন্দ্রের মাতা একপ্রকার মৃত্যুশয্যাগত ; অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য মণীন্দ্রকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক ; মাতা পুত্রের সহিত শেষ সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন।

কাগজে ইহা হইয়া খুব আন্দোলন চলিল।

কিছুদিন অনুসন্ধান ও বিবেচনার পর পত্র আসিল, মণীন্দ্র এখন অত্যন্ত অসুস্থ ও দুর্বল—এতদূর পথ তাঁহার এ শরীরে যাওয়া অসম্ভব। মণীন্দ্রের মাতার অসুখের জন্য গভর্নমেন্ট অত্যন্ত দুঃখিত এবং আশা করেন তিনি শীঘ্র রোগমুক্ত হইবেন। মণীন্দ্র একটু সুস্থ হইলে তাঁহাকে মায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইবে। মণীন্দ্র তখন এ জেল হইতে ও জেলে স্থানান্তরিত হইয়া অবশেষে বর্মার জেলে আসিয়া সত্যসত্যই অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। মণীন্দ্র যে এতদূরে গিয়া পড়িয়াছে, সে কথা সুশীলাসুন্দরীর কাছে গোপন রাখা হইয়াছিল।

চিকিৎসা বা শুশ্রূষার কোন ক্রটি হইল না। শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ দেখিলেন, পুত্র কন্যা পুত্রবধূরা প্রাণপণে শুশ্রূষা করিতেছেন ; কিন্তু রোগ একটুও কমিল না। জীবনের আশা যখন একপ্রকার রহিল না, মণীন্দ্রকে

দেখিবার ইচ্ছা ও আশা তাঁহার প্রবল হইয়া উঠিল। প্রতিদিন প্রভাতে স্নান করিয়া স্নান করিয়া থাকেন, আজ হয়ত মণী ফিরিবে। বাহিরে পদশব্দ শুনিলে তিনি চমকিয়া উঠেন, এক একবার তাড়াতাড়ি উঠিতে যান। কাছে যে থাকে সে তাঁহাকে ধরিয়া বলে মা, উঠবেন না, কেউ নয়। তিনি ক্লান্ত হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করেন; মুদ্রিত চক্ষুর মধ্য দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়ে।

একদিন প্রভাতে স্নান করিয়া নিজেকে যেন অনেকখানি স্নান মনে করিলেন। তাঁহার কৃষ্ণ পাণ্ডুর মুখে সত্যসত্যই এক প্রকার উজ্জ্বলতা ফুটিয়া উঠিল।

ফণী ও সুরেশবাবু—সবে মাত্র হাত মুখ ধুইতে গিয়াছেন। ইন্দু ও কমলা উঠিয়া বাহিরে গিয়াছে। উষা সাবধানে স্নান করিবার হাত মুখ ধুয়াইয়া দিয়া বলিল—মা এবার ওষুধটা দিই ?

অতি প্রসন্ন নেত্রে পুলকিত পানে চাহিয়া স্নান করিবার বলিলেন—বৌমা মা-রাজরাজেশ্বরী হও মা !

উষার চোখের কোলে কোলে জল ভরিয়া আসিল। উষা বলিল—কেন মা, আজ এমন করে কথা বলছেন ?

আজকাল কথা কহিতে গেলেই স্নান করিবার চোখে জল আসিয়া পড়ে। তিনি বলিলেন—“তোমার আশীর্বাদ কচ্ছি, মা। আমার বড় সেবা করেছ তুমি। ছেলেমেয়েতেও অত করতে পারে না।”

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চোখের কোণ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। উষা চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিল—“আমি কি আপনার মেয়ে নই মা ?”

স্নান করিবার উষার গায়ে স্নেহভরে হাত রাখিয়া বলিলেন—“তুমি আমার ছেলের চেয়ে বড়, মেয়ের চেয়ে বেশী।”

উষা আবার পুরাতন কথা পাড়িল—এবার ওষুধটা দিই মা ?

সুশীলাসুন্দরী ধীরে ধীরে বলিলেন—বোমা, আজ আর ওষুধ খাবনা।
আমি আজ সব দেখতে পাচ্ছি—সব বুঝতে পাচ্ছি।

উষা ভয় পাইয়া বলিল,—ও রকম করে বলবেন না মা, আপনার
পায়ে পড়ি।

সুশীলাসুন্দরী বলিলেন, ভয় কি মা! তুমি বড় বৌ, তোমাকে যে সব
তাতে স্থির থাকতে হবে। আমি মা তোমাদের সংসারের ছেলেবেলাতেই
বড় বৌ হয়ে এসেছিলাম; কারণ উপর রাগ পর্যন্ত করবার যো
ছিলনা।

উষা কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—আনিও তো রাগ করিনা মা।

সুশীলাসুন্দরী বলিলেন—তা আমি জানি মা! এখন শোন বোমা,
সবার অসাক্ষাতে তোমাকে একটা কথা বলে যাই।

উষা মাথা নীচু করিয়া বলিল—কি মা সুশীলাসুন্দরী গলার স্বর আর
একটু নীচু করিয়া বলিলেন, ইন্দুর ভার তোমার ওপর দিয়ে গেলাম মা।
ওকে তুমি দেখো। ইন্দু যদি বিয়ে করতে না চায়, ওর অমতে ওর বিয়ে
দিতে দিওনা। এর কারণও তোমাকে বলে যাচ্ছি মা। অভাগী মণীকে
মনে মনে ভালবাসে। যখন আনি একথা জানতে পারলাম, তখন আমি
ছোট বোমাকে পেয়েছি। তা নইলে আনি ওর জীবন কি এমনি করে
ব্যর্থ হতে দিই? তোমায় আমি এ গোপন কথাটি বলে গেলাম মা,—
এ কথা তুমিও গোপন রেখ। ফণী এ কথা জানে না, যদি ইন্দুর বিবাহ
দিতে ফণী পীড়াপীড়ি করে তা হলে কেবল তাকে বোলো, ইন্দু মণীকে
অনেকদিন থেকে মনে মনে ভালবাসে; ও আর কাউকে বিবাহ করতে
পারবে না। তাই আমি বারণ করে গেছি। ছোট বোমা যেন না
জানতে পারেন। মায়ের যে কোমল মন বড় ব্যথা পাবেন তা হলে।
বাছা আমার কেঁদে মারা হবে।

কমলা বস্ত্রাদি পরিবর্তন করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে যাইবে এমন সময় এই কথা কয়টি তাহার কাণে পেল—অভাগী মণীকে ভালবাসে।

কে সে অভাগী? কমলার আর পা উঠিল না। বাকি কথা কয়টা সে অনিচ্ছাতেও শুনিয়া ফেলিল। ইহা শুনিয় তাহার মুখ চোখের অবস্থা যে রকম হইল, যে সে মুখ চোখ লইয়া কমলা গৃহমধ্যে আসিতে সাহস করিল না। পায়ে পায়ে আপনার কক্ষে ফিরিয়া আসিল।

ক্রমশঃ একে একে সবাই সুশীলাসুন্দরীর ঘবে ফিরিলেন। সুশীলাসুন্দরীকে অন্যদিনের চেয়ে একটু সুস্থ দেখিয়া সকলে প্রফুল্ল হইলেন।

ফণীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—মা আজ একটু ভাল মনে কচ্ছেন?

সুশীলাসুন্দরী একটু ম্লান হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ বাবা।

উষা বলিল, মা আজ ওষুধ খান্ নি। ফণী মায়ের পানে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, কেন মা?

সুশীলাসুন্দরী সাস্থ্যের স্বরে বলিলেন, তার জন্ম দুঃখ পেওনা বাবা। আর আমার ওষুধের দরকার নেই।

সুরেশবাবু শিয়রের কাছে বসিয়াছিলেন। আর একটু সরিয়া আসিয়া বলিলেন, এ কথা কেন বল্ছ ভূমি?

কথা কয়টি এমন গভীর স্নেহ ও বেদনার সহিত উচ্চারিত হইয়াছিল, যে তাহা শুনিবামাত্র সুশীলাসুন্দরীর দুই চক্ষু বাষ্পাকুল হইল। স্বামীর পানে মধুর দৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি বলিলেন, দেখ, আজ আমি অনেক কথাই বলতে পারছি। আমি স্পষ্ট অনুভব করতে পারছি যে তোমার কাছে বেনীক্ষণ আর আমি থাকতে পাবনা। মণীকে এখানে দেখা আমার অদৃষ্ট আর নেই। তবু যেন মনে হয়,—কাল রাতে আমি তাকে দেখেছি। ফণী যখন কাল রাতে ঐ সবুজ আলোটা কমিয়ে আমার চোখের আড়াল করে রেখে গেল, আমি তখন

চোখ বুঁজে মণীর মুখখানি ভাবছিলাম। ঋণিক পরে কে যেন বললে, আয় আমার সঙ্গে, মণীকে দেখবি। আমার শরীরের সকল গ্লানি তখন কেটে শরীর এমন হাল্কা হয়েছে যে, আমার রোগের যেন চিহ্ন পর্যন্ত নেই। আমি যেন তাঁর ইচ্ছামত বাতাসে ভেসে যেতে লাগলাম। উপরে নীল আকাশ, সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে, নীচে নীল সমুদ্র কোথায় চুটে গেছে। সে সমুদ্র শেষ হয়ে এল, তবু আমার চলার শেষ হ'ল না। আরও অনেক দূর গিয়ে এক প্রকাণ্ড ভেলখানার সামনে গিয়ে আমাকে নামতে হ'ল। আমরা আস্তেই লোহার প্রকাণ্ড দরজা খুলে গেল। ভিতরে গেলাম। দেখলাম একটা ঘরের মধ্যে খাটের উপর আমার মণী শুয়ে আছে। অত রাত্রেও একজন ডাক্তার তার নাড়ী দেখছে; আর একজন তাব মুগের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটু পরে দু'জনে কি পরামর্শ করে মণীকে ইন্ডুকশান দিলে, মণী চোখ মেলে চাইলে। আমাকে দেখে তার গ্লান মুখখানি হাসিতে ভরে উঠল। বলল, মা তুমি এসেছ, এবার আমি শীগগির ভাল হয়ে উঠব।

তারপর সব যেন ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

সুশীলাসুন্দরী এতগুলি কথা একসঙ্গে কহিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ নিস্তরু হইয়া রহিলেন।

সকলেরই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। কমলা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুশীলাসুন্দরী কমলাকে কাছে ডাকিলেন, কমলা কাছে আসিলে তাহার চক্ষু মুছাইয়া চিৎকে হাত দিয়া বলিলেন—সুশী, মা আমার, কেঁদোনা। আমি তোমায় নিশ্চয় করে বলে যাচ্ছি, মণী ফিরে আসবে।

ফণার পানে ফিরিয়া বলিলেন—বাবা ফণী, মণী ফিরে এসে আমার না

দেখে যেন চোখের জল না ফেলে। তাকে বোলো তার জন্ম আমি আমার বুকভরা আশীর্বাদ রেখে যাচ্ছি—তার সাধনা যেন সফল হয়।

তারপর স্বামীর পানে চাহিয়া বলিলেন, এবার বড় ঘুম আসছে, একটু ঘুমুই ?

স্বরেশবাবু বলিলেন, হ্যাঁ ঘুমোও, আমি তোমার কপালে হাত বুলিয়ে দিই।

সুশীলাসুন্দরী অত্যন্ত আরামের সহিত কিছুক্ষণ চক্ষু মুদিয়া রহিলেন।

একটু পরে চক্ষু মেলিয়া স্বামীর পা দুখানি হাত দিয়া মুছাইয়া আপনার মাথায় রাখিলেন। একবার মধুর হাসিয়া স্বামীর পানে চাহিয়া বলিলেন, আমি তাহলে আগে যাই—তোমার জন্ম অপেক্ষা করে থাকিগে।

তারপর চক্ষু মুদিয়া ধীরে ধীরে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। সে নিদ্রা এখানে আর ভাঙিল না।

ইহার পরদিনই গৌরান্দ তঁাহার সমস্ত সঞ্চিত সম্পত্তি দেশের ভাণ্ডারে অর্পণ করিলেন ও তঁাহার প্রচুর অর্থপ্রসূ ব্যারিষ্টারি বৃত্তি ত্যাগ করিয়া সস্ত্রীক মহাত্মা প্রদর্শিত অসহযোগব্রত গ্রহণ করিলেন।

মণীন্দ্রের সঙ্গে মায়ের দেখা হইল না। এদিকে কমলা পীড়িত হইয়া পড়িল। মণীন্দ্রকে লইয়া যাওয়ার পর হইতে কমলা আপনার শরীরের কোন যত্ন করিত না। সুশীলাসুন্দরী যতদিন ছিলেন, একপ্রকার জোর করিয়াই তাহাকে সময়মত স্নান করাইতেন খাওয়াইতেন। কিন্তু দুঃখ দিনের পর দিন মনের মধ্যে কঠিন পাষণের স্তূপ হইয়া জমিতেছিল। সে দুঃখ কমাইবার বা রোধ করিবার তিনিও কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেন না।

সুশীলাসুন্দরীর মৃত্যুর পর কমলা আরও ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার পিতামাতা লইতে আসিলেন। কমলা অশ্রুজলে ভাসিয়া তাহাদের বুঝাইল, এসময়ে স্বশুরকে ছাড়িয়া যাওয়া তাহার উচিত নহে। কন্যার কঙ্কালসার মূর্ত্তি দেখিয়া মায়ের হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছিল; তথাপি কন্যার মুখ চাহিয়া তিনি দ্বিতীয়বার অনুরোধ করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন এখানে থাকিলে কমলা তবু কিছু শান্তি পাইবে। এ দুঃখের মধ্যেও সে যদি একটু শান্তি পায় সেই ভাল। দুজনেই প্রতিদিন একবার করিয়া দেখিতে আসিতেন।

বর্ষা আসিল। কমলার অসুখ আরও বাড়িল। রোগ ক্রমে থাইসিসে পরিণত হইল। ক্রমশঃ কমলা শয্যাগত হইয়া পড়িল। ডাক্তারের মতে জীবনের আর আশা রহিল না।

কণীন্দ্র এবার মণীর মুক্তির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। গভর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন করিল। ইংরাজী বাংলা সংবাদ পত্রে লিখিয়া পাঠাইল—
মাত্র সন্দেহে রাজবন্দী মণীন্দ্রের শরীর অত্যন্ত অসুস্থ। মা যখন মৃত্যু-

শয্যায় তখনও আবেদন করা হইয়াছিল, কোন ফল হয় নাই। এবার মণীন্দ্রের স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়, এবারও যদি আবেদন বিফল হয় তাহা হইলে স্ত্রীর সঙ্গেও তাঁহার শেষ সাক্ষাৎ হইবে না।

এই সময়ে ইন্দু সমস্ত কাজ ফেলিয়া দিবারাত্রি কমলার কাছে থাকিত। তাহার সমস্ত শুশ্রূষার ভার সে আপনি গ্রহণ করিল। কমলার পুত্রের ভার লইল উষা।

ইন্দুর মুখের পানে কমলা অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে, আর অনেক কথা ভাবে। একদিন ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা ভাই, তুমি আমার মুখের পানে মাঝে মাঝে চেয়ে থাক কেন ?

কমলা। তোমায় দেখি।

ইন্দু। কেন, আমি কি তোমার কাছে নূতন ?

কমলা। নূতন নও ; কিন্তু তবু তোমায় দেখি আর ভাবি তুমি এত করে আমার সেবা কর কেন ?

ইন্দু। তোমাব সেবা করা বেশী কথা হ'ল কি ? আমার যদি অসুখ হ'ত তুমি কি করতেনা ?

কমলা। করতে চাইতাম—কিন্তু এর অর্দেকও বোধ হয় করতে পারতাম না। অন্য কেউ হলে আমার উপর কত রাগ করত।

ইন্দু। রাগ করত ! কেন ?

কমলা। তোমার যা কিছু আমি এতদিন ধরে ভোগ-দখল করে আসছি, তাই।

ইন্দু। তুমি আমার কিছু ভোগ দখল করনি ভাই। তাছাড়া তুমি তো জানতে যে এ বিষয় আমার, আর আমিও জানতাম না যে আমার কোন বিষয় আছে। তখন আর তোমার দোষ কি ? কিন্তু এতদিন পরে সে সব কথা কেন ভাই ? এখন মন চঞ্চল কোরোনা ভাই।

শাগুগির সেরে ওঠো লক্ষ্মী ভাই । মণীদা আসুন, তাঁর কাছে তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে তবে আমি নিশ্চিত হব ।

কমলা । কেন ভাই ? তিনি কি তোমায় কিছু বল গেছেন ?

ইন্দু । হ্যাঁ, তিনি তোমার ভার আমার উপর দিয়ে গেছেন ।

কমলা শুনিয়া স্তম্ভ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল ।

ইন্দু । অমন করে নিঃশ্বাস ফেললে কেন ভাই ?

কমলা । তুমি বুঝি ভাই আমায় এত বল কর ? নইলে করতে না ।

ইন্দু । নইলেও করতাম—তবে এত উদ্বেগ থাকত না ।

কমলা । কিসের উদ্বেগ ?

ইন্দু । তোমার এই রুগ্ন শরীর দেখে তিনি কি ভাববেন !

কমলা । আর বুঝি ভাব আমি যদি মরে যাই, তিনি এলে কি বলবেন—নয় ?

ইন্দু । তুমি যদি এমনি পাগলামি কর, আমি ঘরে গিয়ে চুপ করে বসে থাকব—খাবনা দাবনা, কিছু না ।

কমলা । না ভাই আর বলব না—তুমি রাগ করবে না তো ?

ইন্দু । না ।

ইন্দু কমলার কপালে মাথার ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল । কমলা কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল । আবার একটু পরে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ।

সুরেশবাবু ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কেমন আছ মা ?

কমলা । বোধ হয় ভাল আছি বাবা ।

সুরেশবাবু কমলার কপালে হাত দিয়া উদ্ভাপ পরীক্ষা করিলেন । বলিলেন—‘জ্বর একটু কম বোধ হচ্ছে আজ নয় মা ইন্দু ?’

ইন্দু তৎক্ষণাৎ বলিল—হ্যাঁ আজ একটু কমই।

সুরেশবাবু। আজ একটা সুখবর আছে মা।

ইন্দু। কি খবর জ্যাঠামশায়?

দুজনেরই বুক আশা ও আশঙ্কায় দুরু দুরু করিতে লাগিল।

সুরেশবাবু। এতদিন পরে ভগবান্ মুখ তুলে চেয়েছেন। মণী মুক্তি পেয়েছে। কাল সন্ধ্যায় জাহাজে এসে পৌঁছবে। তোমরা কেউ বিচলিত হোয়ো না মা। সে এসে বেন তোমাদের কাউকে কাতর না দেখে।

তারপর সুরেশবাবু ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

সুরেশবাবু উঠিয়া যাইতেই কমলা ইন্দুর মুখের পানে চাহিয়া অশ্রুজলে ভাসিয়া ডাকিল—ভাই!

ইন্দুরও চক্ষু ছাপিয়া অশ্রু ছুটিল। সেও কোনমতে বলিল, কি ভাই!

তারপর দুজনের অশ্রুপ্রবাহ দুজনকে শান্ত করিল। কিছুক্ষণপরে কমলা কথা কহিল—ভাই!

ইন্দু। কি ভাই!

কমলা। আমি কি দেখতে বড্ড বিস্ত্রী হয়ে গেছি?

ইন্দু। কেন, বিস্ত্রী হবে কেন?

কমলা। এই রোগে ভুগে ভুগে।

ইন্দু। না ভাই, ও মুখ কখন বিস্ত্রী হয়? কেবল রোগা হয়ে গেছ।

কমলা। যদি আমাকে দেখে তিনি রাগ করেন?

ইন্দু। রাগ করবেন না। তোমায় আরও বেশী করে ভালবাসবেন।

ভালবাসার জন কষ্ট পেলে ভালবাসা আরও বেশী হয়।

কমলা। তিনি এসে আমার কি বলবেন আমি তাই ভাবছি।

ইন্দু। বলবেন, আমার সোণার কমল এত রোগা হয়ে গেছে। আর
এই মুখখানি তুলে ধরে—

বলিয়া ইন্দু চুম্বন করিবার ভঙ্গী করিল।

কমলা আনন্দে চক্ষু মুদিয়া রহিল। তাহার সর্বদেহ ক্ষণে ক্ষণে
শিহরিয়া উঠিতে লাগিল।

৪৪

সন্ধ্যায় মণীন্দ্রকে সগৌরবে স্টেশন হইতে আনিবার সব ব্যবস্থা ঠিক
হইয়াছিল। অপ্রত্যাশিতভাবে সকাল ৬টার মণীন্দ্রের ষ্টীমার ঘাটে
আসিয়া লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের দুইজন উচ্চ কর্মচারী একখানি
টাক্সি করিয়া মণীন্দ্রকে বাসার পৌছাইতে আসিল। রোগীর চেয়ারে
বসাইয়া মণীন্দ্রকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল।

সংবাদ পাইবামাত্র আত্মীয় বন্ধু সকলে ছুটিয়া আসিলেন। সেই
মণীন্দ্রের শরীরের এই অবস্থা! যে দেখিল, তাহারি চোখে জল
আসিল।

আত্মীয় বন্ধু সব চলিয়া গেলে মণীন্দ্র বলিল, আমাকে আগে মাতার
ঘরে একবার নিয়ে চল, দাদা।

ভৃত্যেরা চেয়ার উঠাইতে আসিলে মণীন্দ্র দাদার পানে চাহিয়া বলিল—
আমি তোমার কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে বাই।

ফণীন্দ্র মণীকে ধরিয়া তুলিল। মণী ফণীন্দ্রের কাঁধে ভর দিয়া দাঁড়াইতে
ফণীন্দ্র বাঁ হাত দিয়া ভ্রাতার কটিদেশ বেঁঠন করিয়া ধরিল। দুই ভাই
তখন ধীরে ধীরে মায়ের কক্ষে প্রবেশ করিল।

দেওয়ালের গায়ে মায়ের চিত্রখানি তখনো টাঙ্গানো। মা এখনো

যেন হাসিমুখে চাহিয়া আছেন। দুইবৎসর পরে মণীন্দ্র মৃত্তি পাইয়াছে। একবৎসর অটমাস পুত্রের পথপানে চাহিয়া চাহিয়া মাতা শেব নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। মায়ের শত চিন্তা, সহস্র বেদনা, অগণিত দীর্ঘশ্বাস, প্রতিদিনের সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা যেন মৃত্তি ধরিয়া মণীন্দ্রের চক্ষের সন্মুখে ভাসিয়া উঠিল। কক্ষতলে বসিয়া পড়িয়া মেনের উপর মাথা লুটাইয়া মণী যুক্ত করে বহুক্ষণ ধরিয়া মায়ের চরণোদ্দেশে প্রণাম করিল। পরে মাথা তুলিয়া সজল নয়নে বলিল, দাদা মা আমার কথা কি বলে গেছেন?

মণীন্দ্র সাক্ষনয়নে কহিল, মা যতদিন রোগশয্যায় ছিলেন ততদিন তাঁর মুখে তোমার কথা ছাড়া অন্য কথা বড় একটা ছিল না। মৃত্যুর দিনে খালি তোমার কথাই করে গেছেন। বলে গিয়েছেন, মণী ফিরে আসবেই। আমার অদৃষ্টে নেই তাই দেখা হ'ল না। সে এলে তোরা বলিস্, আমি বুক ভরে তার জন্ত আশীর্বাদ রেখে যাচ্ছি। সে যে পথ বেছে নিয়েছে সেই পথেই মণী যেন সিদ্ধিলাভ করে।

তরপর চক্ষু মুছিয়া ফণী আবার বলিল—আমাদের মত মা ক'জনের হয় তাই। পূর্বজন্মের অনেক পুণ্য ছিল, তাই এমন মায়ের গর্ভে জন্মেছিলাম।

এমন সময় সুরেশবাবু ধীরে ধীরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দুজনেরই চক্ষে বিগলিত অশ্রুধারা দেখিয়া তাঁহার সৌম্যশাস্ত্র মুখে বেদনা কুটিয়া উঠিল।

মণীন্দ্র পিতার পানে চাহিয়া বলিল, বাবা আজ যদি এসে মাকে দেখতে পেতাম, তাহলে আমার এই দুবছ'রের জেলের কষ্টের জন্ত কোন ক্ষোভ থাকত না।

সুরেশবাবু বলিলেন—তোমরা চোখের জল ফেলে তাঁর আত্মাকে ব্যথিত কোরো না। সর্কক্ষণ অনুভব কোরো—চিরদিন মনে রেখো

তাঁর নির্যমল নিষ্পাপ আত্মা তোমাদের মঙ্গল চিন্তায় সর্বক্ষণ তোমাদের পাশে আছেন। এমন পবিত্র আত্মা তোমাদের মায়ের ছিল, যে তাঁর ইচ্ছাতেই কার্য হ'ত।

মৃত্যুর দিনে তিনি বলেন, কাল রাত্রে আমি মণীকে দেখেছি। অকাশের নীচে ভাসতে ভাসতে যাচ্ছি, নীচে সমুদ্র, ডাক্তারেরা তোমাকে ইন্জেকশান দিচ্ছেন, তুমি বড়ই রোগী হয়ে গিয়েছ। এমন ভাবে এ সব কথা তিনি বলেন, যেন এইমাত্র প্রত্যক্ষ করে এলেন। অথচ তাঁকে আমরা বলিনি যে তোমাকে বর্ম্মার জেলে রাখা হয়েছে।

মণীন্দ্র বলিল, বাবা, আমিও সে রাত্রে মাকে ঠিক দেখেছি। যেন মনে হ'ল মা আমার শয্যার সন্মুখে এসে দাঁড়াইলেন। আমার গায়ে হাত বুলািয়ে দিয়ে বলেন, ভয় নেই বাবা শীগ্গির সেরে যাবি, আবার বাড়ী ফিরে যাবি। মায়ের সে কথা আর সে দৃষ্টি আমি জীবনে কখন ভুলবনা।

সুরেশ বাবু বলিলেন,—এবার মণি, তুমি আমার ছোটমার কাছে একবার যাও। তোমাকে দেখে তিনি যদি সেরে ওঠেন, তবু আমার অনেকটা সাহুনা থাকবে।

ইন্দু কমলাকে এই সময়টায় ইচ্ছা করিয়াই একা রাখিয়াছিল। মণীন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া দেখিল শীর্ণা কমলা দুয়ারের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছে।

মণীন্দ্র দীর্ঘ শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কমলার একখানি শীর্ণ হাত আপনার হাতের মধ্যে রাখিল। কমলা মুখ তুলিয়া স্বামীর মুখের পানে সজল নয়নে চাহিয়া রহিল। তাহার দুই বৎসরকার সঞ্চিত সকল বাণী অশ্রুসাগরের মধ্যে কোথায় হারাইয়া গেল!

মণীন্দ্র আসিতে কমলার অবস্থা একটু ভাল হইতে লাগিল। হঠাৎ একদিন যে টুকু উন্নতি হইয়াছিল তাহা অন্তর্হিত হইয়া কমলার অবস্থা অতি সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। যে কোন মুহূর্তে সকলে তাহার মৃত্যু প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

মণীন্দ্র পূর্বাপেক্ষা—সুস্থ হইয়াছে ও বল পাইয়াছে। সে দিন কমলা স্বামীকে নির্জনে পাইয়া বলিল—তুমি যখন আসনি, তখন কেবলই আমি ভগবানের কাছে মান্তাম—তঁাকে এনে দাও, ঠাকুর! তঁাকে একটি বার দেখে আমি যেন মরি।

কিন্তু তোমাকে দেখে তোমাকে ছেড়ে আর মরতে ইচ্ছা করছে না।

মণীন্দ্র কমলার কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, তুমি বাঁচবেনা কে বললে কমলা ?

কমলা। আমি যে নিজে বুলতে পাচ্ছি—তোমার চোখের পানে চেয়ে জানতে পাচ্ছি।

মণীন্দ্র। শক্ত রোগ কি মানুষের হয় না—তুমি ও রকম কথা বোলোনা।

কমলা। কেন আমাকে ভোলাচ্ছ? তার চেয়ে আমার যা বুলবার আছে তাই বুলতে আমাকে অনুমতি দাও; তুমি বোলোনা বললে আমি তো বুলতে পারব না।

মণীন্দ্র। তোমার কি কথা বুলবার আছে—বল।

কমলা। আমার একটা কথা রাখবে?

মণীন্দ্র। কি কথা বল।

কমলা । তুমি আগে বল রাখবে । এই আমার শেষ কথা ; জীবনে আর কখন তোমার কাছে কিছু চাইব না—এই আমার শেষ চাওয়া—বল রাখবে ?

মণীন্দ্র । তুমি কেন্দনা—কি কথা বল, রাখবো

কমলা । খোকা ধনকে আর তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার প্রাণ চাইছে না । কিন্তু যেতেই হবে । তোমাদের দু'জনকে আমি আর একজনের হাতে সঁপে দিয়ে যেতে চাই । তাকে তুমি আমার জায়গায় গ্রহণ করে খোকার মায়ের অধিকার তাকে দিও । —তুমি অমন করে চেয়োনা, মুখ ফিরিওনা । তুমি জাননা, ইন্দু দিদি তোমাকে কত ভাল বাসে । তোমাকে সে ভালবাসে তাই সে আর কাউকে বিবাহ করতে চায়নি, আর করবেও না । আমার একথা তুমি অবিশ্বাস কোরোনা । আমি মায়ের মুখ থেকে একথা শুনেছি । আমার কথাটা আগে আমাকে শোন করতে দাও—তারপরে তুমি যা হয় বোলো । ইন্দু দিদি আমা হতে সব থেকে বঞ্চিত হয়েছে । তার অগাধ ঐশ্বর্য—আমি তার এতদিন উত্তরাধিকারিণী ছিলাম । তোমায় সে অনেক দিন থেকে ভালবাসে আমি এসে কেড়ে নিলাম । তারপর এমনি তার অদৃষ্ট, তুমি আবার তারই হাতে আমার ভার দিয়ে গেলে ! কিন্তু এততেও সে আমার উপর একদিনও এতটুকু বিরক্ত হয়নি । আমাকে সে যে কি যত্ন করেছে, তা তুমি সবারই মুখে শুনেছ । কিন্তু আমার কাছেও তুমি একবার শোন । ইন্দু দিদি মা মারা যাবার পর থেকে মাস চারেক সত্যিকারের রাত্রে ঘুমায় নি । আমার রোগ এমন যে, রাত্রে কিছুতেই ঘুম আসত না । ইন্দু দিদিও আমার সঙ্গে জাগত ।

কমলা—এক সঙ্গে এতগুলি কথা বলায় শ্রান্ত হইয়া চুপ করিল । মণীন্দ্র নির্বাক হইয়া ভাবিতে লাগিল । ইন্দুর চোখের চাহনি, তাহার

হাতের অবাচিত স্ননিপুণ সেবা, তাহার অভীক্ষিত সমস্ত কার্যে ইন্দুর অসীম অনুরাগ—সর্বোপরি তাহার কাঁরাবাস যাত্রার দিন তাহার পায়ের উপর ইন্দুর সেই সজল চুম্বন যাহা সে সেদিন ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারে নাই ও তাহার অর্থও খুঁজিয়া পায় নাই—সে সমস্ত একে একে তাহার মনে উদ্ভিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, কমলার কথা। কি উদার, পবিত্র, স্বার্থলেশ শূন্য হৃদয় লইয়া কমলা পৃথিবীতে আসিয়াছিল।

মণীন্দ্রের চোখে জল আসিল।

কমলা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, তুমি বুঝি কাঁদছ—আমার কথায় উত্তর দিলেনা? তুমি কেঁদোনা, চুপ কর—আমার কথায় রাজী হও, আমার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ কর। নইলে আমার কি হবে! আমি কি করে শান্তিতে মরব।

মণীন্দ্র অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে বলিল, আমায় কেন এমন শান্তি দিচ্ছ কমলা? আমি তোমার কি দোষ করেছি?

না গো তুমি কোন দোষ করনি, তুমি দোষ করতে পারনা;—তুমি আমায় দয়া কর, আমায় শান্তিতে মরতে দাও।

বলিয়া কমলা শয্যা হইতে উঠিবার চেষ্টা করিয়া মণীন্দ্রের পায়ের উপর মাথা লুটাইল।

কমলার আর্ন্তব্যাকুলতা মণীন্দ্রকে অতিশয় কাতর করিয়া তুলিল। সময়ে কমলার মাথা বালিশের উপর তুলিয়া দিয়া অতি কষ্টে সে বলিল—তুমি যাতে শান্তি পাও, তাই হবে।

কমলা পরম অনুরাগ ভরে স্বামীর ডান হাত খানি দুই হাত দিয়া ধরিয়া আপনার বুকের উপর রাখিয়া কিছুক্ষণের জন্য চক্ষু মুদিল। তাহার মুদিত চক্ষুর দুই প্রান্ত দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

অপরাজিত কমলার শরীর কেনন যেন অবসন্ন হইয়া আসিল। ডাক্তার আসিয়া নাড়ী দেখিয়া বাহিরে আসিয়া সুরেশবাবুকে বলিলেন, আজই শেষ রাত্রি।

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। সুরেশবাবু আবার কমলার ঘরে প্রবেশ করিয়া কমলার শিয়রে বসিলেন। ইন্দু ও উষা তখন কাছে বসিয়াছিল। সুরেশবাবু বলিলেন, তোমরা একটু বরং ঘুরে এস। আমি একটু মায়ের কাছে বসি।

ইন্দু ও উষা কিছুক্ষণের জন্য উঠিয়া গেল।

সুরেশবাবু কিছুক্ষণ কমলার ক্ষীণ পাণ্ডুর মুদিত নেত্র মুখমণ্ডলের পানে চাতিয়া থাকিয়া উঁকিলেন—কেনন আছ মা ?

কমলা চমকিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিল। স্বশুরকে দেখিয়া একবার ডাকিল—‘বাবা’ ! পরক্ষণে আবার চক্ষু মুদিল।

সুরেশবাবু কমলার ললাটে হাত দিয়া বলিলেন,—কেন মা ? কি বলছ ?

কমলা আবার চক্ষু মেলিল। আবার ডাকিল, ‘বাবা’।

সুরেশবাবু যুম ভাঙ্গাইবার মত উচ্চ কণ্ঠে কহিলেন, কি কষ্ট হচ্ছে মা ?

কমলা স্তম্ভ কাতর দৃষ্টিতে আর একবার চাহিল।

সুরেশবাবু পুনরায় বলিলেন, অনমন করে চাইছ কেন মা ? কি বলতে চাও, আমায় বল।

কমলা ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, বাবা, একটা কথা বলতে যাচ্ছি, পাচ্চিনে।

সুরেশবাবু। তুমি আমার মা ! কি বলতে চাইচ বল মা—
লজ্জা কি ?

কমলা। আমার জন্ম ইন্দুদিদি সব থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ইন্দু দিদির সব অধিকার আমি আজ তাঁকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমার জায়গায় তাঁকে আপনি গ্রহণ করবেন।

সুরেশবাবু। কেন তুমি একথা বলছ মা ?

কমলা। আজ মা তো নেই—তাই আপনাকেই একথা বলে যাচ্ছি।
মা একদিন দিদিকে একটা কথা বলছিলেন, আমি সেই ঘরে ঢুকতে গিয়ে
শুনে ফেলেছিলাম। আমার প্রার্থনা রাখুন বাবা।

সুরেশবাবু। মা, মণী যদি রাজী হয় আমি তোমার কথা রাখব।
কিন্তু তোমায় আমি কখন ভুলব না। তোমার আর কি ইচ্ছা বল মা।

কমলা। আগে যেমন সবাই এক ঘরে জমা হ'ত, গান হ'ত। আজ
একটিবার তাই দেখতে আর শুন্তে ইচ্ছা করছে।

সুরেশবাবু উষাকে ডাকিয়া কাছে বসিতে বলিলেন। ইন্দুকে বলিলেন,
মণী ছোট মাকে গান শোনাবে, তুমি তার সব ব্যবস্থা করে দাও মা।
তখন সূর্যাস্ত আসন্ন হইয়া আসিয়াছে ; আলো টুকু নিভিয়া গেলেই সন্ধ্যা
নামিবে।

সকলে কমলার ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন। গায়কের আসন কমলার
ঠিক পাশেই। কমলা একটি স্বদেশী গান শুনিতে চাহিল।

মণীন্দ্র কমলার পানে একবার ব্যথিত—দৃষ্টিতে চাহিয়া গাহিল—

সার্থক জনম আমার

জন্মেছি এই দেশে।

সার্থক জনম মাগো

তোমায় ভালবেসে।

জানিনে তোর ধন রতন

আছে কিনা রাণীর মতন,

সুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায়

তোমার ছায়ায় এসে।

কোন বনেতে জানিনে ফুল
গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন গগনে ওঠেরে চাঁদ
এমন হাসি হেসে ।
অঁাখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জড়ালো
ঐ আলোতে নয়ন রেখে
মুদ্ব নয়ন শেষে ।

শীর্ণ শরীরেও মণীন্দ্র গানটি বড়ই মধুর গাছিল : কমলা গানের মধ্যে একেবারে ডুবিয়া গেল । তাহার অশ্রুসিক্ত চক্ষু দুটি শিশির সিক্ত পদ্যের শোভা ধারণ করিল । গানের শেষের সঙ্গ সঙ্গ সে একবার স্বামীর দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করিল । পরক্ষণে মুখখানি বিবর্ণ হইয়া আসিল ।

ইন্দু কমলার পাশেই শস্যার উপর বসিয়াছিল । সে কাঁদিয়া উঠিল ।

কমলা যতক্ষণ পারিল স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রহিল, তারপর সে আলোকে সে প্রথম নয়ন মেলিয়াছিল, সেই আলোকেই তাহার নয়ন দু'টি শেষ বার রাখিয়া চিরতরে মুদিত করিল ।

পরিশিষ্ট

বৎসর দশেক পরে কলিকাতার বিখ্যাত নারী চিকিৎসাগার কমলাশ্রমের সম্মুখে একখানি গাড়ী আসিয়া থামিল। ভিতর হইতে একজন পুরুষ, বারো বৎসরের একটি সুন্দর ছেলের হাত ধরিয়া একটি মহিলা নামিলেন। তিন জনেরই পরনে মোটা খদরের পরিচ্ছদ। তাঁহারা আশ্রমের উপর উঠিবামাত্র প্রধান কর্মচারী ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধনা করিলেন। আশ্রমের সুপ্রশস্ত বারান্দার মাঝখানে একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর স্ত্রীমূর্তি—নীচে লেখা—কমলা দেবী। মহিলাটি বস্ত্রভাঙ্গুর হইতে একটি ফুলের মালা লইয়া মূর্তির গলদেশে পরাইয়া দিলেন। পুরুষটি মূর্তির দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। বালক সেখানে লুটাইয়া মূর্তিকে প্রণাম করিল।

তারপর পুরুষটি অফিসে বসিয়া কর্মচারীর সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। মহিলা ছেলেটির হাত ধরিয়া আশ্রমের ভিতর প্রবেশ করিলেন। কক্ষে কক্ষে ঘুরিয়া রোগিণীদের দেখিলেন, তাহাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার কি অভাব অভিযোগ তাহার সংবাদ সংগ্রহ করিলেন। এক নবাগতা রোগিণী ছোট্ট একটি ছেলে লইয়া আসিয়াছে, তাহার ছেলেটিকে কোলে লইয়া আদর করিলেন।

তারপর মহিলা বাহিরে আসিলেন। পুরুষটি তাঁহাদের সহিত মিলিত হইতে তিনজনে আবার গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

একজন ফরাসী দেশীয় পরিব্রাজক কিছুদূর হইতে এই সব লক্ষ্য

করিতেছিলেন। ইঁহারা চলিয়া গেলে তিনি প্রধান কর্মচারীর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এ মহিলাটি কে বলিতে পারেন ?

ইনি এই নারী চিকিৎসাগারের প্রতিষ্ঠাত্রী।

এ মন্দির মূর্তি কার ?

ঔর স্বামীর প্রথমকার পত্নীর নাম কমলা দেবী ; এঁরই স্মৃতিরক্ষার জন্য এই চিকিৎসাগারের প্রতিষ্ঠা।

সঙ্ঘের পুরুষটি ওই মহিলাটির স্বামী ?

আজ্ঞে হ্যাঁ

উনি কি করেন ?

উনি একজন বিখ্যাত দেশ সেবক।

ছেলেটি ওই মহিলারই বোধ হয় ?

হ্যাঁ ওঁই ছেলে বটে—তবে ঔর গর্ভজাত নয়। খাঁর মন্দির স্মৃতি দেখেছেন তাঁরই ছেলে ওটি উনি পুত্রনির্কিশেবেই পালন করেছেন।

এঁরা এখন গেলেন কোথায় ?

সুশীলাশ্রমে—সেও ঔরই প্রতিষ্ঠিত, একটি আদর্শ নারী শিক্ষালয়। ঐ মহিলার শাস্ত্রীর স্মৃতি রক্ষার জন্যে সে আশ্রম স্থাপিত।

এ সবে তো বহু অর্থের প্রয়োজন হয়েছে—এত অর্থ মহিলাটি কোথায় পেলেন ?

উনি বাংলা দেশের এবং বিখ্যাত ভূস্বামীর একমাত্র কন্যা। ঔর সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি এই দেশ হিতকর কাজে ব্যয় করেছেন।

তার পর পরিব্রাজক পুরুষ এ মহিলার নাম ও ঠিকানা আপনার নোটি বুক টুকিয়া লইলেন। যাইবার সময়ে বলিয়া গেলেন,—দলুবাদ আমি আজ এই শিক্ষা পাইলাম যে, কোন দেশের নরনারীর সম্বন্ধে যদি কিছু জানিতে হয় তো, সেই দেশে পদব্রজে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তবে তাহা জানা

উচিত। ঘরে বসিয়া স্বল্প জ্ঞান বা দেশগত ঈর্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত যে কোন পুস্তকের লেখায় নির্ভর করা কর্তব্য নহে।

আর একবার প্রসংশমান দৃষ্টিতে কমলাশ্রমের দিকে চাহিয়া পরি-
ব্রাজক দীরে দীরে বাতির হইয়া গেলেন।

বলা বাহুল্য এই তিন জন—মণীন্দ্র, ইন্দু ও তাঁহাদের এক মাত্র পুত্র-
কমলার গচ্ছিত ধন—তুঃখ হরণ।

গ্ৰন্থকাৰেৰ অধ্যায় পুস্তক

অপূৰ্ণ

দীৰ্ঘ বিচ্ছেদেৰ পৰ পিতাপুত্ৰেৰ মিলন । এ মিলনে চোখে অশ্ৰু আসে ;
হৃদয়ে অপূৰ্ণ ভাবেৰ উদয় হয় ; মনেৰ মলিনতা দূৰ হয় । নানা চৰিত্ৰ ও
ঘটনাৰ বিচিত্ৰ সমাবেশ । গাইছা উপন্যাস—দুই টাকা মাত্ৰ ।

অশ্ৰু-নিৰ্বাৰি

পানদোষ কি কৰিয়া মুখেৰ সংসার নষ্ট কৰে, কি কৰিয়া দেবতা দানবে
পৰিণত হয় তাহাৰ নিখুঁত ছবি । সৰ্বসহা বসুমতীৰ অবিচল স্বামী
প্ৰেম, ভ্ৰাতাৰ গভীৰ স্নেহ, কৃতজ্ঞতাৰ নিৰ্মল নিদৰ্শন চলচ্চিত্ৰেৰ মত
একটিৰ পৰ একটি চক্ষুেৰ সন্মুখে ভাসিয়া উঠিবে । দুই টাকা মাত্ৰ ।

কাল-শ্ৰী

উপন্যাস (২য় সংস্কৰণ)—আট আনা মাত্ৰ ।

প্ৰশান্ত

শিক্ষাসংকীৰ্ত্তন একমাত্ৰ উপন্যাস । পিতামাতাৰ শিক্ষা কি কৰিয়া
শিশুগণেৰ মুখেৰ হাসি চিৰদিন অম্লান থাকে, কেমন কৰিয়া তাহাদেৰ
আনন্দ বজায় রাখিয়া তাহাদেৰ এই কঠিন সংসারপথেৰ পথিক কৰা যায়,
আবার কি কৰিয়া সরল, সুন্দৰ, উৎসাহদীপ্ত পুত্ৰ কন্যা উৎসাহহীন হইয়া
পড়ে তাহা দেখিয়া ক্ষোভে দুঃখে চোখে জল আসিবে । দেড় টাকা মাত্ৰ ।

পাথৰেৰ দান

গল্পগ্ৰন্থ—আট আনা মাত্ৰ ।

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত

—অভিনব উপন্যাসাবলী—

সংসারে বাস করিতে হইলে দশের মধ্যে একজন হইয়া থাকিতে গেলে—
মানুষের কি ভাবে থাকা উচিত, কি করা উচিত, কোথায় তাহার
দৌর্বল্য—এ সবই জানা উচিত। যদি আপনার মহত্বে ও গুণগরিমায়
মুগ্ধ করিয়া আপনার সংসার, স্বজন ও স্বদেশকে গড়িয়া তুলিতে চান,
লেখিকার প্রত্যেক বইখানিই যেন সজীব। নিম্নলিখিত বইগুলিই
আপনাদের সে বিষয়ে সাহায্য করিবে।

খেয়ার শেষে

দুই টাকা

স্নেহের মূল্য পথের শেষে

দুই টাকা

দুই টাকা

তরুণের অভিযান

নূতন যুগ

দেড় টাকা

দেড় টাকা

বিসর্জন

আশুপ্তী

দেড় টাকা

আট আনা

বঙ্গপল্লী

দানের মর্যাদা

আড়াই টাকা

দুই টাকা

অন্ধা

বিজিতা

আট আনা

আড়াই টাকা

দার্শনিক পণ্ডিত দুঃস্বপ্নমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত

বিনিময়

মনোজ্ঞ বাঁধাই, ও বহু চিত্র-শোভিত অপূর্ব পুস্তক ।

গ্রন্থকারের রচিত “মিলন-মন্দিরে”র মতই অপূর্ব ।

বাঙ্গালার ভাগ্যদোষে ও কর্মফলে ঘরে ঘরে ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদের আগুন জলিয়াছে সে অগ্নি নির্ঝাণের একমাত্র ঔষধ গৃহলক্ষ্মীদের একটু বিবেচনা, ভ্রাতৃগণের একটু সাবধানতা । ইহা পাঠে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ প্রশমিত হইবে ।

অভিজ্ঞ গ্রন্থকার শক্তিশালিনী আবেগময়ী ভাষায় পুণ্যের “বিনিময়ে” শান্তি—পাপের “বিনিময়ে” প্রায়শ্চিত্তের উজ্জল চিত্র দেখাইয়া বঙ্গসংসারকে যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা সকলেরই শিক্ষণীয় । দেড় টাকা ।

মিলন-মন্দির

বঙ্গ-সংসারের—নিখুঁত চিত্র—

বহু মনোরম চিত্র ও সঙ্গীত আছে ।

আপনার স্ত্রী পুত্র-কন্যা ও আত্মীয়দিগের হস্তে দিলে, আপনার সংসার সোণার সংসারে পরিণত হইবে । দুই টাকা ।

ছিন্নমস্তা

নিঃস্বার্থ প্রেমের অপূর্ব পরাকাষ্ঠা—আত্মত্যাগের

পূর্ণ-প্রতিমা অপূর্ব “বিমল” চরিত্র

ঘটনার পর ঘটনা,—কৌতূহলের পর কৌতূহল । এমন সুন্দর ঘটনা বৈচিত্র্যময় উপন্যাস বঙ্গভাষায় কমই আছে । এক টাকা ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস :-

শশিনাথ

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

প্রেমের বিবিধ ও বিচিত্র রঙ্গ ও লীলা এই কথখানি গ্রন্থে সুনিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে। বর্ণে বর্ণে লাইনে লাইনে তৃপ্তি, আনন্দ প্রসাদে ভরপুর। আড়াই টাকা।

রাজপথ

ঋষি নির্দেশিত পথই পথ—‘আর পথ নাই’ এ কথা আর বলা চলিবে না। এই নিদ্রিত জাতির—অধঃপতিত সামাজিক জীবের জীবনধারা পরিবর্তন করা একান্তই আবশ্যিক হইয়াছে। “রাজপথ” তাহার পথ নির্দেশ করিয়াছে। তিন টাকা।

অমলা

অমলার ভাব, ভাষা, চরিত্র গরিমা, চরিত্রের নূতনত্ব সরল, সহজ উদার ভাব নির্মূল স্বভাব, কর্তব্যাপরায়ণতা, চরিত্র-রক্ষণে দৃঢ়তা ও আত্ম বিশ্বাসী হৃদয় অতুলনীয়। দুই টাকা।

অমূলতরু

“অমূলতরু” যে অনাবিল করুণ-রস আপনাকে দান করিবে, তাহাতে আপনি নব-জীবন পাইবেন। দুই টাকা।

নবগ্রহ

রুচি মার্জিত ষড়সাত্ত্বক নয়টি গল্পে নবগ্রহ সুশোভিত। দেড় টাকা।

গুরদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩/১১, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা

